JUNE 1988

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : শক্তির বিকল্প উৎস : আবদুল্লাহ্ আলমুতী

রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ
পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক নির্বাচিত
গ্রন্থতালিকা—৮০-৮১-৮২, ৮৩-৮৪

অন্নদাশঙ্কর রায়	লালন ও তাঁর গান	১০.০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	বনে জঙ্গলে	১৫.০০
সমরজিৎ কর	কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান	২১.০০
অন্নদাশঙ্কর রায়	হট্টমালার দেশে	৮.০০
গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য	পশু পাখী কীটপতঙ্গ	১০.০০
অরূপরতন ভট্টাচার্য	রোবোট এল কেমন করে	৮.০০
সুনির্মল বসু	রোমাঞ্চের দেশে	৬.০০
সমরজিৎ কর	নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী	২০.০০
প্রবোধবন্ধু অধিকারী	চিৎপুর চরিত্র	২৫.০০
শীতাংশু মৈত্র	যুগন্ধর মধুসূদন	১৫.০০
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	তেপান্তর	২০.০০
অমরনাথ রায়	জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা	১০.০০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	ছোঃ সন্দীপন পাঠশালা	১০.০০
অমরনাথ রায়	সংখ্যা নিয়ে খেলা	৮.০০
আর্থার কোনান ডয়েল	কিশোর গোয়েন্দা গল্প	১০.০০
আর্থার কোনান ডয়েল	কিশোর রহস্য গল্প	৮.০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র	ঘনাদা বিচিত্রা	২০.০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	অপুর ছেলেবেলা	১০.০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কিশোর অপু	২০.০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ছোটদের অপরাজিত	১০.০০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ছোটদের কাশীনাথ	১০.০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	পশুপক্ষী	২০.০০
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	বাঙলার ডাকাত (১-৪)	৩২.০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	খুকুমণির ছড়া	১০.০০

সাহিত্য সংগ্রহ ও বিবিধ প্রবন্ধ

অন্নদাশঙ্কর রায়
স্বাধীনতার পূর্বাভাস ১৫

প্রবোধবন্ধু অধিকারী
চিৎপুর চরিত্র ২৫

অনন্ত সিংহ
কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত ২০

মণি বাগচি
সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ ১৬

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
মুনশী রামরাম বসু ২০

শীতাংশু মৈত্র
যুগন্ধর মধুসূদন ১৫

রমাপদ চৌধুরী
আমরা সবাই ১০

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
পুরাতন গদ্যগ্রন্থ সঙ্কলন ১ম ও ২য় খণ্ড ৩৫

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
বিনোদ বিনোদিনী ২০

বিপিনবিহারী গুপ্ত
রবীন্দ্র সঙ্গ প্রসঙ্গ ৩০

শ্রীম কথিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২৫

উপন্যাস

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
মানুষের সত্যাসত্য ৩০

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়
থমকে কেন দাঁড়িয়ে ১০

দক্ষিণারঞ্জন বসু
কখনো সম্রাজ্ঞী ৮

অমিত রায়
দুই রমনীর গপ্পো ১০

সুকুমার ভট্টাচার্য
সবাই মিলে ৬

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

ছবি, ছড়া ও গল্পের বই

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
খেলার সাথী ৬.০০

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
কথামালার গল্প ৪.০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
টেনিদার কুট্টিমামা ৫.০০

ধীরেন বল
ঠেকে হাবুল শেখে ৫.০০

দেবাশীষ বল
বাঘ সাপ হাতি ৬.০০

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
মনোহর ডাকাত ৬.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
কচিমুখের ছড়া ৫.০০

দক্ষিণারঞ্জন বসু
ঠাকুমার ঝুলি ৮.০০
ঠাকুরদাদার ঝোলা ১০.০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্র
ছোটদের রামায়ণ ১০.০০
ছোটদের মহাভারত ১০.০০

মনি বাগচি
অমর চরিত কথা ৭.০০

অখিল নিয়োগী
ছবিতে সাধারণ জ্ঞান ১০.০০

তপনময় ঘোষ
ডেড লাইন ৩১ অক্টোবর ১০.০০

হান্নান আহসান
স্পোর্টস ক্যুইজ ১৮.০০

রঞ্জন সক্লাসিক্‌ কমিক্‌স
অগ্নিগিরির গুপ্তধন ৩.০০
শেষ বিজয় ৩.০০
কলঙ্কিত ছোরা ৩.০০
মুক্তিযোদ্ধা ৩.০০
মৃত্যু মাতাল অরণ্য ৩.০০
সাগর শয়তান ৩.০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
জুন ঃ 1988

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

আকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করাশি

লিখবেন

জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রধান সম্পাদক ঃ **সমরজিৎ কর**
সম্পাদক ঃ **রবীন বল**
সহ সম্পাদক ঃ **জয়ন্ত দত্ত**

সূচীপত্র

চিঠিপত্র ঃ 4

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর ঃ ঝড় জল কুয়াশা ॥ সমরজিৎ কর 7

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ঃ গ্রহের ফাঁদ ॥ শ্রীধর সেনাপতি 35

প্রচ্ছদ নিবন্ধ ঃ শক্তির নতুন উৎস ॥ আবদুল্লাহ আলমুতী 19

পড়াশোনা ঃ মজার অঙ্ক ॥ জয়ন্ত ঘোষ দস্তিদার 29 ঃ নিওন ॥ অমরনাথ রায় 15 ঃ বল ও তার প্রকৃতি ॥ সমীর কুমার ঘোষ 16

কমপিউটারের কলাকৌশল ঃ কমপিউটার কি করে কাজ করে ॥ সৌম্য মিত্র 52

ছড়া ঃ যে কোন একটি ॥ তপোময় ঘোষ 42

শরীর-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ঃ ই সি জি ॥ আশিস মান্না 30

ধারাবাহিক রচনা ঃ ভবিষ্যদ্বাণী রহস্য ॥ অদ্রীশ বর্ধন 21 ঃ নীল সাগরে রহস্য ॥ দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 31

গাছপালা ঃ কলমীর গুণাগুণ ॥ ছন্দোময় মণ্ডল 39

জানা-অজানা ঃ দেবব্রত রায়, অসীম হালদার' রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় 6

ফিচার ও ছবিতে গল্প ঃ আবিষ্কারের গল্প ও কীটপতঙ্গের গল্প ॥ অলয় ঘোষাল 11, 14 ঃ আবিষ্কারক কলম্বাস ॥ গৌতম কর্মকার 12 ঃ খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 23

জ্ঞান বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা ঃ পরিবেশ দূষণ এবং বিজ্ঞান ক্লাবগুলির ভূমিকা ॥ পার্থ মুখোপাধ্যায় 27 ঃ থার্মমিটার কে অবিষ্কার করেন ॥ লতিকা দত্ত 40 ঃ মৌলিক পদার্থের নামকরণ ॥ নিত্যগোপাল বসু 41 ঃ জ্ঞান বিজ্ঞানের বই 17 ঃ ইলেকট্রনিক্‌স ক্যুইজ ॥ বিপ্লব ব্যানার্জী 51 ঃ বিজ্ঞানের খবর ॥ জয়ন্ত মণ্ডল 6 ঃ বিজ্ঞান সমাবেশ 56 ঃ বিজ্ঞান সংবাদ 66

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ ঃ সফল উত্তরদাতাদের নাম 62 ঃ বলতে পারো কেন ॥ সুধাংশু পাত্র 59 ঃ জল নিয়ে খেলা অপরাজিত বসু 61 ঃ ক্যুইজ কনটেস্ট, শব্দকূট ও আই কিউ টেস্ট 55 ঃ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সমাধান 58 ঃ শব্দকূট ॥ মলয় ভট্টাচার্য 58

পুনর্মুদ্রণ ঃ ঘনশ্যাম চরিত কথা ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র 9

বিশেষ রচনা ঃ ঘনাদার স্রষ্টা ॥ রবীন বল 43

প্রচ্ছদ ঃ অলয় ঘোষাল ॥ **অন্যান্য ছবি ঃ** অলয় ঘোষাল ও সুবোধ মণ্ডল

বিঃ দ্রঃ অনিবার্য কারণবশতঃ গৌতম কর্মকারের "যুগের ভিতর যুগ" চিত্র-কাহিনী এবারে প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

চিঠিপত্র

আবিষ্কারের গল্প : লেখকের উত্তর

মার্চ 1988তে প্রকাশিত আবিষ্কারের গল্পে 'সেলাই কল' আবিষ্কারকের নাম মুদ্রণ প্রমাদ বশতঃ 'হাও' এর বদলে 'হাও' হয়েছে। ইলিয়েস বা ইলিয়াস যে কোন একটি বলা যায়। ইংরাজী বানান Elias Howe। এখন মূল কথাটি হল প্রকৃত আবিষ্কারক কে ?

সেলাই মেশিন আবিষ্কারের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, 1790 সালে থমাস সেন্ট নামক লণ্ডনের একজন ক্যাবিনেট প্রস্তুতকারক প্রথম সেলাই মেশিনের পেটেন্ট নেন। এটা ছিল এক সুতো বিশিষ্ট, সেলাই এর ধরন ছিল শিকলের মত। কিন্তু কিছু ত্রুটি থাকার জন্য মেশিনটি কার্যকর হয়নি।

1810 সালে বি. ক্রেমস নামে এক জার্মান বিজ্ঞানী সেলাই মেশিন তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তা বাণিজ্যিক ভাবে সফল হয়নি। এরপর I830 সালে বারথেলেমি থিসোনিয়ার, পেশায় দর্জি, ফ্রান্সের লোক, যে সেলাই মেশিন আবিষ্কার করেন, তাই হয় প্রথম সফল এক সুতো, ও শিকলের মত সেলাই বিশিষ্ট সেলাই মেশিন। যাই হোক যারা সেই সময় হাতে সেলাই করতো তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই ভেবে সেই মেশিনটি নষ্ট করে দেয়। কিন্তু তারপর থিসোনিয়ার এর থেকে আরও উন্নত কোন মেশিন তৈরি করতে পারেন নি।

এরপর 1830 সালের প্রথমে লক স্টিচ (Lock-stitch) সেলাই বিশিষ্ট (যে সেলাই বৈশিষ্ট্যই আধুনিক সেলাই মেশিনে দেখা যায়) সেলাই মেশিন নিউ ইয়র্কের ওয়াল্টার হান্ট আবিষ্কার করেন। কিন্তু এটিও কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার-যোগ্য হয়নি। এরপর 1846-এ ইলিয়েস হাও প্রায় একই ধরনের সেলাই মেশিন আবিষ্কার করেন যেটি আধুনিক সেলাই মেশিনের সঙ্গে বহুলাংশে সম বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। এরপর 1851 সালে একজন আমেরিকান নাম আইজ্যাক এম সিঙ্গার (যার নামে এখনকার সিঙ্গার মেশিন বাজারে পাওয়া যায়) আধুনিক সেলাই মেশিনের কাঠামো তৈরি করেন। তার পরেও 1852 সালে এ্যালেন বি উইলসন ঘূর্ণায়মান হুক বিশিষ্ট ববিনওলা উন্নত ধরনের মেশিন তৈরি করেন। এবং 1854 সালে তিনিই এই মেশিনের আরও উন্নতি সাধন করেন। 1851 সালে থিসোনিয়াসের আবিষ্কৃত এক সুতোওয়ালা শিকল সেলাই বিশিষ্ট সেলাই মেশিনের উন্নতি সাধন করে দুই সুতোওয়ালা ঐ জাতীয় সেলাই মেশিন তৈরি করেন উইলিয়াম ও. গ্রোভার নামক এক বিজ্ঞানী।

কিন্তু আধুনিক সেলাই মেশিনের সেলাই এর যে চরিত্র অর্থাৎ lock stitch সেলাই বিশিষ্ট সেলাই মেশিনের আবিষ্কারক হলেন ইলিয়েস হাও। সেই হিসাবেই আমরা ইলিয়েস হাওকেই সেলাই মেশিনের আবিষ্কারক বলতে পারি। এবং একদম প্রথমের আবিষ্কারক ধরলে কিন্তু আমরা থিসোনিয়াসের নাম না ক'রে বি ক্রেমস এর নামই বলবো। —**অলয় ঘোষাল**, কদমতলা, হাওড়া।

লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ

'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশিত গত দুই বছরের ভৌত বিজ্ঞানের ও জীবন বিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী আমার বিশেষ সুবিধায় এসেছে। ঐ সব সংখ্যাগুলো থেকে আমি ভৌত বিজ্ঞানে ও জীবন বিজ্ঞানে 85% এরও বেশি কমন পেয়েছি। এজন্য আমি সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক লেখকের কাছেই কৃতজ্ঞ এবং ঋণী 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকার কাছে।

আরও একটা বিষয়ের কথা উল্লেখ না করে পারছি না! এই পত্রিকা পূর্বে পরীক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয় যথা 'ঐচ্ছিক গণিত', 'ভৌত বিজ্ঞান', 'জীবন বিজ্ঞান' ইত্যাদি বিষয়ে নম্বর বাড়ানোর পদ্ধতি, সুষ্ঠুভাবে উত্তর লেখার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে পরীক্ষার্থীদের মনোবল যেভাবে বাড়িয়ে তোলে তা নিঃসন্দেহে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আশা করি এই রকম আলোচনা আমার মত আরও অনেক পরীক্ষার্থীর মনোবল বাড়িয়ে তুলতে সফল হয়েছে।

দিব্যেন্দু চক্রবর্তী, S/o কেশবরঞ্জন চক্রবর্তী, পোঃ কলেজ টীলা, আগরতলা।

আই-কিউ টেস্ট

আমি আপনাদের প্রকাশিত 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। মার্চ '88 সংখ্যায় 58 পৃষ্ঠায় 'আই কিউ টেস্ট'-এ 2 নম্বর প্রশ্নে লেখা আছে এক অণু K^2SO^4 কে জলে দ্রবীভূত করলে কতো সংখ্যক আয়ন উৎপন্ন হয়। এটা না হয়ে এক অণু K_2SO_4কে জলে দ্রবীভূত করলে কতো সংখ্যক আয়ন উৎপন্ন হয়। এটাই হত। তাই এরপর যাতে ভুল না হয় তার জন্য আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ রইল।

ত্রিদিবেশ দে, গ্রাঃ-দাহাদয়া, পোঃ-অলঙ্কারপুর, মেদিনীপুর।

মডেল নির্মাতাদের প্রতি অনুরোধ

আমি একজন আর্টসের স্নাতক। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠক। আর্টসের স্নাতক হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানার ইচ্ছায় খুবই আগ্রহ সহকারে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পড়ি। উপকৃতও হই। তাই এই পত্রিকার 'নিজে নিজে কর' বিভাগে মডেল তৈরি সম্বন্ধে যে সব বন্ধু আলোচনা করেন তাঁদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ এই পত্রিকার মাধ্যমে যে, তাঁরা যেন এমন সহজ সরল ভাবে বিস্তারিত বিবরণ সহ আলোচনা করেন যাতে আমরা যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করিনি, তাঁদের যেন বুঝতে অসুবিধা না হয়। যেমন মডেল তৈরির উপকরণগুলি কত সহজ ভাবে যোগ করে তার পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়া যাবে। মডেল তৈরির বিভিন্ন উপকরণগুলির পৃথক পৃথক নাম কি রকম। মোট কত খরচ হতে পারে। মডেল তৈরির জিনিস-গুলি কোথায় কোন দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে ইত্যাদি। সেই সাথে আমার একটা অনুরোধ কোন বন্ধু যদি "নিজে কর বিভাগে" **"ইনটার-কম মোশন"** তৈরির মডেল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন, কিভাবে তৈরি করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে শিক্ষা দেন তাহলে খুবই উপকৃত ও খুশি হব।

সৈয়দ রাবিউল আলম, পোঃ—কেউগুড়ি, জেলা—বর্ধমান।

আবিষ্কারের গল্প

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের এপ্রিল '88 সংখ্যায় অবাক হলাম 'আবিষ্কারের গল্প' পড়ে। এখানে মোটর সাইকেলের আবিষ্কারের গল্প নামে চালানো হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় ওটাকে আবিষ্কারের গল্প না বলে মোটর সাইকেলের বর্ণনা নাম দেওয়া বেশি যুক্তিযুক্ত। কারণ ওতে একমাত্র ইঞ্জিন সংযোজক গটলি-এবং ডোমলার-এর নাম এবং 1885 খ্রীস্টাব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। অপর দিকে চাকা, হ্যাণ্ডেল, ব্রেক, প্রভৃতির বর্ণনা রয়েছে (যা পর্যাপ্তও নয়)।

ননীগোপাল মণ্ডল, বামনসরিষা, লালনগর, মেদিনীপুর, 721424

ইলেকট্রনিক্স

গত মার্চ মাসের '88 সংখ্যায়, বিপ্লব ব্যানার্জী জানিয়েছেন, ইলেকট্রনিক্স ক্যুইজ সম্বন্ধে। তাতে তিনি ইলেকট্রন কণিকার ব্যাস দিয়েছিলেন যথাক্রমে—

a) $5 \cdot 598 \times 10^{-13}$c.m.

b) $1 \cdot 135 \times 10^{-12}$ c.m.

c) $6 \cdot 019 \times 10^{-8}$ c.m.

এই বিষয়ে আমি কখনও বিপ্লব ব্যানার্জীর সাথে এক মত হব না। কারণ ইলেকট্রন কণিকার ব্যাস কখনও ঐগুলি হবে না। ইলেকট্রন কণিকার ব্যাস $5 \cdot 6 \times 10^{-13}$ c.m.

অসীম ব্যানার্জী, মুর্শিদাবাদ।

ইলেকট্রনিক্স ক্যুইজ ও পড়াশোনা

মার্চ '88 সংখ্যার K J.B.তে 51 পৃষ্ঠায় বিপ্লব ব্যানার্জীর 'ইলেকট্রনিক্স ক্যুইজ' Part IIতে 3নং প্রশ্নে ইলেকট্রন কণিকার আধান জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। উনি উত্তর দিয়েছেন $1 \cdot 6 \times 10^{-19}$ কুলম্ব। কিন্তু যেহেতু Electron (−) Charge যুক্ত কণিকা, সুতরাং উহার আধান $1 \cdot 6 \times 10^{-19}$ না লিখে $-1 \cdot 6 \times 10^{-19}$ লিখলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হত। এবং 5নং প্রশ্নে Electron-এর ভর 9.11×10^{-28}gm না লিখে $9 \cdot 108 \times 10^{-28}$ gm অর্থাৎ accurate ভরটি লিখলেই ভাল হত।

ঐ সংখ্যারই K.J.B.তে 52 পৃষ্ঠায় 2nd paraতে শেষের দিকে 'নাইট্রোজেন' সম্বন্ধে লেখক বলেন যে 'হেনরি ক্যাভেণ্ডিশ' নাইট্রোজেনের ধর্ম বিশ্লেষণ করে উহার নাম রাখেন 'অ্যাজোট' (azote)। কিন্তু যতদূর সম্ভব 1775 খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানী ল্যাভয়-সিয়ার গ্যাসটির নাম দেন 'অ্যাজোট' বা নিষ্প্রাণ বায়ু।

আমার ধারণা কি ভুল?

অনিরুদ্ধ সরকার, 2, কলেজ স্ট্রিট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ঘোষণা

কাগজ ও অন্যান্য মুদ্রণ ব্যয় বৃদ্ধির জন্য কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান এর দাম আগামী জুলাই '88 সংখ্যা থেকে অনন্যোপায় হয়ে 50 পয়সা বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। আশা করি পাঠকবর্গ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। **প্রচার সম্পাদক : কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান**

বিজ্ঞানের খবর

পুষ্টি যোগাতে পোকামাকড়

তেলেপোকা, ছারপোকা, ঝিঁঝিঁ পোকা ইত্যাদি পোকামাকড় খাওয়ার কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। কিন্তু থাইল্যাণ্ড ব্যাংককে কিংবা মেক্সিকোতে পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে এসব খুবই জনপ্রিয়। ব্যাংককে এবং থাইল্যাণ্ডের উত্তর পূর্বে খরা ও ভাঙনের এলাকা আইজান, যেখানে পুষ্টি প্রধান সমস্যা—সেখানে তেলেপোকা আর ঝিঁঝি পোকা পুষ্টি সমস্যা দূর করতে এগিয়ে এসেছে। এদেরকে বলা হয় 'উড়ন্ত চিংড়ি'। অপরদিকে মেক্সিকোতে জলজ ছারপোকা ও এক ধরনের জলজ ডিম পুষ্টির বিকল্প খাদ্য হিসাবে বাজার পেয়েছে। এ সব পোকামাকড়ে অন্যান্য মাংসের মতোই পুষ্টির পরিমাণ বজায় আছে।

ব্রিফ কেসে টেলিফোন

এখন আর অফিস বাড়ি বা গাড়িতেই শুধু টেলিফোনের ব্যবহার নয়। এবার যার যার ব্রিফ কেসে টেলিফোন থাকবে। এ প্রসঙ্গে হংকংয়ের একজন নির্মাতা বলেন, এই সুবিধা জনতার প্রয়োজনীয় সময় অনেকটা বাঁচাবে।

টাকে চুল

চীনের নানান রকম গাছপালা থেকে টাকে চুলের জন্য ওষুধ প্রস্তুত করা হয় একথা প্রাচীন কাল থেকেই এশীয়রা জানতো। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ঝাও নামে এক গ্রাম্য চীনা চিকিৎসক ও কৃষক 1970 সাল থেকে বিভিন্ন রকম চানা গাছ-গাছড়া নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি নানান ধরনের তেল ও গাছের গুঁড়ো মিশিয়ে একটা মলম তৈরি করেন। নাম দেন 101 মলম। ব্যবহার করে টেকো লোকের মাথায় চুল গজানো সম্ভব হয়েছে। এজন্য ঝাও বেজিংয়ে 101 মলম উৎপাদন করার একটা ছোট কারখানা তৈরি করেন। গতবছর (87) ব্রাসেলস-এ ইউরেকা বিশ্বমেলায় 101 মলম প্রথম পুরস্কার লাভ করে।

চোখ দিয়ে কথা বলা

যারা কথা বলার অথবা নড়াচড়া করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন তাদের জন্য এগিয়ে এসেছে নতুন প্রযুক্তি। উপাদান ; এক জোড়া গগ্‌লস। তাতে থাকবে এক জোড়া বিশেষ ধরনের লেন্স। প্রতিটি লেন্সে যুক্ত হবে একটি ছোট ইনফ্রারেড চক্ষুর্মণি। এসবের সাথে সংযোগ থাকবে একটি কম্পিউটারের। এর ফলে পর্দায় ভেসে উঠবে মানুষটির মনের কথা। এটি উদ্ভাবন করেছে ইসরাইলের টেকনিসিয়ন ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি।

—জয়ন্ত মণ্ডল

জানা-অজানা

মরদেহের ব্যবসায় নিষ্ঠুর ঘাতক

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকের ঘটনা। এডিনবার্গের একটা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রদের পঠনের জন্য প্রয়োজনীয় মরদেহের যোগানদার ছিল বার্ক নামে এক ভদ্রলোক। এটাই ছিল তার জীবিকা।

অবাক হবার মতো ব্যাপার হলো যেসব শবদেহ বার্ক কলেজে বিক্রি করতো তাদের প্রত্যেকটিই বার্কের নিজের হাতে অতি সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা।

বার্কের নিজের কথাতেই জানা যায় যে সে কাউকে তার বাড়িতে ডিনারে নেমন্তন্ন করতো। তারপর পানভোজনের বিপুল সমারোহে অতিথিকে বেঁহুঁশ করে ফেলতো। এই সময়ে বার্ক তাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে নাকমুখে কাপড় চাপা দিয়ে নিজে সে তার বুকের উপর চেপে বসতো। তার এই কাজের আরেক সাকরেদ ছিল হেয়ার নামে আরেকজন।

খানিকক্ষণের মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটত।

এই ব্যবসায় কিন্তু এরা খুব বেশিদিন চালাতে পারেনি। ধরা পরে গিয়ে সব স্বীকার করে। তাদের শাস্তিও হয়।

এদের এই কুকীর্তিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ফরেনসিক বিজ্ঞানে এখনো এ ধরনের হত্যাকাণ্ডকে বলে BURKING.

—দেবব্রত রায়

প্রাচীন জীবাশ্ম

আজ থেকে 5কোটি বৎসর পূর্বে—পৃথিবীতে এমন একটি পাখির সন্ধান মিলত যেটি ছিল আকারে বিশাল। এই বিশালায়তন পাখিটির নাম টেরোজার (Pterozeur)। এর এক একটি ডানার মাপ ছিল প্রায় 15.5 মিটার। বিজ্ঞানীরা পাঁচ কোটি বৎসর আগেকার এই পাখির জীবাশ্ম সম্প্রতি আমেরিকার টেক্সাস অঞ্চল থেকে আবিষ্কার করেছেন।

অসীম হালদার—

তিমি শিকারের হারপুন

তিমি সবচেয়ে বৃহৎ প্রাণী আবার নীল তিমি সর্বাধিক আকারে বড়। নৌকা বা জাহাজ থেকে দড়ি বাঁধা হারপুন (harpoon) নামক বর্শা ছুঁড়ে এর গায়ে বেঁধা হয় তিমি পালাতে থাকতে থাকলে নৌকা বা জাহাজ তিমির সাথে সাথে যেতে থাকে। ক্রমে ক্রমে তিমি নির্জীব হয়ে পড়লে তাকে ধরা হয়ে থাকে। বর্তমান যুগে হারপুণের মাথায় বিস্ফোরক পদার্থ থাকে। হারপুন তিমির শরীরে বিঁধলে সেই বিস্ফোরক পদার্থ তিমির মৃত্যু ঘটায়।

রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়

ঝড় জল কুয়াশা

সমরজিৎ কর

মে মাসের গোড়ার দিকটায় কি অসম্ভব গরমই না পড়েছিল। প্রচণ্ড রোদ্দুর। তা আমাদের দেশে এ সময় রোদ্দুর বাড়েই আর রোদ্দুর বাড়া মানে গরম হাওয়া, চিরকাল তাই তো হয়।

কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু প্রচণ্ড গরমের পর প্রচণ্ড ঝড় এবং তার সঙ্গে প্রবল বর্ষণ—তার কী হোল?

সত্যি কথা কি. বছর পঞ্চাশ আগেও ব্যাপারটা ছিল অন্য রকম। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয় বৈশাখ মাস। সকালে সূর্য উঠত আগুনের হলকা নিয়ে। বেলা বাড়ার সঙ্গে বাড়ত গরম, দুপুর গড়ালেই সারা আকাশের রঙ তামাটে হয়ে উঠত। বিকেলের দিকে দেখা দিত ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। বাতাস থমকে দাঁড়াত। অসহ্য গরমে মনে হত এবার প্রাণ যায়। তার পর সমস্ত আকাশ যেত ঘন মেঘে ছেয়ে। অন্ধকার হয়ে আসত চারদিক। শুরু হত প্রচণ্ড ঝড়। ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বর্ষণ। এ ঝড়ের নামও—কাল-বৈশাখী।

এখন ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে অন্য রকম। বৈশাখ মাসে কিন্তু কালবৈশাখী আসে না। যেমন ঘটল এবার। প্রচণ্ড রোদ্দুর, তার সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। আকাশে মাঝে মাঝে মেঘ দেখা গেল। কিন্তু দেখা গেলে কি হবে কোথাও থেমে বৃষ্টি হিসেবে ঝড়ে পড়বে তার জো নেই। বাতাসের ধাক্কায় পড়ল পড়ল মেঘ ছুটে চলেছে, যেন রাজধানী একস্প্রেস—তাদের থামার সময় নেই। ফলে মেঘ ছিল, বর্ষা ছিল না। বৈশাখের শেষে কোথাও কোথাও অবশ্য ঝড় জল হল—হাওয়া অফিস থেকে বলা হল এটাই নাকি এ বছরের প্রথম কালবৈশাখী। যাঁদের বয়েস হয়েছে, তাঁরা জানেন, তাঁদের ছোট বয়েসে দেখা কালবৈশাখীর সঙ্গে এ কালবৈশাখীর তেমন কোন মিল নেই। এখনকার আবহাওয়া আগের তুলনায় অনেক পাল্টেছে। যার জন্যে মানুষই অনেকাংশে দায়ী।

5 জুন বিশ্বপরিবেশ দিবস। মানুষ তার বিভিন্ন কাজ-কর্মের ফাঁকে প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করেছে, সেটা খতিয়ে দেখার জন্যে এই দিনটি প্রতি বছর আমরা পালন করে থাকি। এই উপলক্ষেই কালবৈশাখীর কথা বললাম।

আমাদের দেশের কথাই ধরো। স্বাধীনতার সময় সময় ভারতের জন সংখ্যা ছিল 35 কোটি, এখন 75 কোটির মত। এত মানুষ! খাবার তো চাই। তাই নাগাড়ে বন কেটে খাদ্যশস্য চাষের জন্যে তৈরি হল নতুন জমি। অরণ্য আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে কিছুটা। সেটা নষ্ট হল। কিভাবে? একটা উদাহরণ দিই, অরণ্য পরিষ্কার করলে মাটি উন্মুক্ত হয়। যে মাটি ছায়া পায় কম, তার আর্দ্রতা কমে। উন্মুক্ত মাটি দিনের দিকে সূর্যের উত্তাপে প্রচণ্ড গরম হয়। ফলে শুরু হয় গরম বাতাসের প্রবাহ। রাতের দিকে ওই মাটি দ্রুত বিকিরণের মাধ্যমে উত্তাপ হারায়। তাই রাতে পরিবেশে তাপমাত্রা দারুণ ভাবে কমে। ব্যাপারটা দাঁড়ায় মরুভূমির মত। জ্বালানি হিসেবে পোড়ান হয় কাঠ। তার ধোঁয়া বাতাস কলুষিত করে। এর জন্যে এবং তার সঙ্গে কলকারখানা থেকে নির্গত কয়লার ধূয়ো, মোটর গাড়ির পেট্রোল এবং ডিজেলের ধোঁয়া—একাকার হয়ে পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে। এতে করে আবহাওয়ার গড় তাপমাত্রা বেড়েছে। বুঝতেই পারছ, তাপমাত্রা বাড়লে সাগর মহাসাগর নদী নালার জল আরো বেশি বাষ্পীভূত হয়। সেই বাষ্প কোথাও বা সৃষ্টি করে ঘন কুয়াশা। কোথাও প্রচণ্ড ঝড়। অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড তো আছেই। কয়লার ধোঁয়ায় সালফার ডাই অক্সাইডও থাকে। এই দুটি গ্যাস বাতাসের জলীয় বাষ্পের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে সৃষ্টি করে কারবনিক অ্যাসিড. সালফিউরাস এবং সালফিউরিক অ্যাসিড। বৃষ্টি এবং কুয়াশার সঙ্গে এই সব অ্যাসিড ভূপৃষ্ঠে অধঃক্ষিপ্ত হয়। পুকুর এবং হ্রদের জলে অ্যাসিডের মাত্রা বাড়ে। এতে করে মাছ এবং জলচর প্রাণীর ক্ষতি হয়। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর স্বাস্থ্যও। ইদানীং তোমরা "অ্যাসিড রেইন"—এর কথা শুনছ। অ্যাসিড মিশ্রিত ওই বৃষ্টি এবং কুয়াশাকেই বলা হচ্ছে "অ্যাসিড রেইন।"

বিজ্ঞানীরা তো রীতিমত শঙ্কিত। তাঁরা বলছেন, আবহাওয়া যে ভাবে পাল্টাচ্ছে, যদি এমনটি চলে, আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবেই। পৃথিবীর বহু অঞ্চলে নামবে প্রচণ্ড খরা। যে সব অঞ্চলে এখনো যথেষ্ট হচ্ছে, সেই সব অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত

হবে। এমনও হতে পারে, যে সব অঞ্চল এখন মরুভূমি, সেখানে বর্ষা বাড়বে। এতে করে কৃষিসমাজের ক্ষতি হবে।

রাজস্থানের থর মরুভূমি এগিয়ে যাচ্ছে দিল্লি এবং পাঞ্জাবের দিকে। বিহার, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় উত্তর এবং মধ্য প্রদেশে ধূলি ঝড় বাড়ছে। ধূলি ঝড়ের দরুন শ্বাস রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ এবং গৃহপালিত পশু।

সমস্যা কি কম? চাষের জল যোগানের জন্যে মাঠে মাঠে বসেছে গভীর নলকূপ। অতিরিক্ত জল তোলায় ভূস্তরের গভীরে যে সঞ্চয় ছিল, তা অনেক কমে গেছে। গভীর ভূস্তরের জলে থাকে অতিরিক্ত পরিমাণ ধাতু—লোহা ইত্যাদি। এই সব ধাতু চাষের মাটির গুণও নষ্ট করেছে। বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্যে বসান হয়েছে পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র। অনেকেই তো জান, ইউরেনিয়ামের বিভাজন ঘটিয়ে এই সব কেন্দ্রে উৎপাদন করা হয় বিদ্যুৎ শক্তি। খুব ভাল কথা। কিন্তু ইউরেনিয়ামের ফলে সৃষ্ট হয় নানা রকম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। যাদের বলা হয় পারমাণবিক জঞ্জাল। এই জঞ্জাল ঠিক মত সংরক্ষণ করা না গেলে জল এবং বাতাসের মাধ্যমে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। যার ফলে ঘটতে পারে ক্যানসারের মত দূরারোগ্য রোগ।

সে দিন এক বয়স্ক ভদ্রলোক দুঃখ করে বলছিলেন, "ছেলেবেলায় আমরা কত কৈ-মাগুর খেয়েছি। সে সব মাছ এখন তো দেখাই যায় না।" তা কি করে আর দেখা যাবে। আগে পুকুর জলা এবং ধানের ক্ষেতে জল জমলে ওই সব মাছের ঝাঁক ভিড় করত। শীতের সময় তাদের পাওয়া যেত প্রচুর। ক্ষেতে কীট নাশক ওষুধ ছড়িয়ে ধান, পাট এবং অন্যান্য শস্য কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করা হচ্ছে। এই সব বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগের স্পর্শে এসে কৈ-মাগুর সাবাড়। এমন কি পুকুর নদী-নালাতেও অন্যান্য মাছের ক্ষতি করছে।

চাষের জমি বেড়েছে প্রচুর। অতিরিক্ত কর্ষণের দরুন জমির মাটি আলগা হচ্ছে। বর্ষায় সেই আলগা মাটি নদীতে এসে পড়ে ধোঁয়ানির সঙ্গে। এ ছাড়া বড় বড় নদীর পাশে বসেছে অজস্র কলকারখানা। তাঁদের ধোয়ানির সঙ্গে নদীতে পড়ে নানা রকম রাসায়নিক যৌগ। তারা নদীগুলিকে করছে ভরাট। নদীর প্রবাহ কমে যাচ্ছে তার ফলে। অতিরিক্ত বর্ষায় দেখা দিচ্ছে প্লাবন। আমাদের দেশে এগুলিই এখন বড় রকমের সমস্যা। 5 জুন এই সমস্যাগুলি নিয়ে মানুষ ভাবুক। সমস্যাগুলির সমাধানে এগিয়ে আসুক এবং সচেতন হোক—এ কথা মনে রেখেই এ দিনটি 'বিশ্ব-পরিবেশ' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক

সমরজিৎ করের দু'খানি বই

পরমাণু গবেষণায় ভারত

প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত ॥ আর্টপ্লেট ছবিসহ ॥ দাম ১০.০০

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম ২০.০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

পুনর্মুদ্রণ

ঘনশ্যাম চরিতকথা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাহাত্তর নম্বরের টঙের ঘরে যে মানুষটি হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হয়ে দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছেন, আর লম্বা চওড়া কথার প্যাঁচ-পয়জারে শিশির, শিবু, গৌর, মায় গোটা বিশ্বভুবনকে নিজের হাঁটুর কাছে নামিয়ে এনেছেন, তাঁর বংশ পরিচয় সে'তো মৌর্য বা মুঘল যে কোনো সাম্রাজ্যের থেকেই মহিমময়।

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে 'দাস হলেন ঘনাদা'-র কথা। সেখানে আমি লিখেইছিলাম 1502 সালে 10টি জাহাজ নিয়ে ভাস্কো-দা-গামা আসে কালিকটে জামোরিনকে শায়েস্তা করার জন্যে। কালিকট লুট করে ছারখার করে দিল ভাস্কো। তারপর সেখান থেকে কোচিন যাওয়ার পথে যে সব জাহাজ ও সুলুপ লুট করে জ্বালিয়ে দেয়, তার মধ্যে একটি মকরমুখী পালোয়ার সদাগরী জাহাজ ছিল। যে জাহাজ সমতট থেকে সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র নিয়ে বাণিজ্য করতে গেছিল ভৃগুকচ্ছে। সেখান থেকে ফেরার পথেই সর্বনাশ। ভাস্কো-দা-গামার পৈশাচিক আক্রমণে সে সদাগরী জাহাজের সমস্ত মাঝি মাল্লারই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় নি। রক্ষা পেয়েছিল একটি দশ বছরের ছেলে। জ্বলন্ত সওদাগরী জাহাজ যখন ডুবছে, তখন ছেলেটি কেমন করে সাঁতরে এসে ভাস্কো-দা-গামারই জাহাজের হালটা ধরে আশ্রয় নেয়। একজন মাল্লা তাকে সেখানে দেখতে পেয়ে পৈশাচিক আনন্দে আরও ক'জনকে ডাকে ছেলেটিকে বন্দুক ছুঁড়ে মেরে মজা করার জন্যে। কিন্তু সেকালের ম্যাচ্‌লক্‌ বন্দুক ছুঁড়তে গিয়ে বন্দুক ফেটে সেই লোকটাই পড়ে মারা। ঠিক সেই সময়ে তিনটে শুশুকের জাতের ডুগংকে জলের মধ্যে ডিগবাজি খেতে দেখা যায় জাহাজের কিছু পেছনে। দুটো ব্যাপার নিজেদের কুসংস্কারে এক সঙ্গে মিলিয়ে দৈবের অশুভ ইঙ্গিত মনে করে ভয় পেয়ে ছেলেটিকে আর মারতে তারা সাহস করে না। তার বদলে তাকে তুলে নেয় জাহাজের ওপরে।

1503 সালে ভাস্কো-দা-গামা লিসবন-এ ফেরবার পর ছেলেটি বিক্রি হয়ে যায় ক্রীতদাসদের বাজারে। সেখান থেকে দশ হাত ফেরতা হতে হতেএকদিন সে কিউবায় গিয়ে পৌঁছয়। দশ বছর বয়সে ভাস্কো দা গামার জাহাজে যে এসেছিল সে তখন চব্বিশ-পঁচিশবছরের জোয়ান। জুয়ারেজ নামে কিউবায় এসে বসতি করা একটি পরিবারে সে ক্রীতদাস।

এই হচ্ছেন ঘনাদা, আমাদের ঘনশ্যাম দাসের পূর্ব-পুরুষ ঘনরাম দাসের গোড়ার কথা। নিজ মুখে ঘনাদা তাঁর নানান অভিযান, কীর্তিকাহিনী, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, কিন্তু কখনও বলেন নি তাঁর বংশ পরিচয়ের কথা। এ ব্যাপারে তিনি প্রায় সনাতন ধর্মের স্বয়ম্ভূ। দাস পদবী ঘনরাম নিজেই নিয়েছিলেন। পালোয়ার সদাগরী জাহাজে ভৃগুকচ্ছে বাণিজ্য যাত্রা দেখে মনে হয় তিনি তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকেই যাত্রা করেছিলেন। সেকালের তাম্রলিপ্ত, এখনকার, তমলুক বন্দর হিসেবে তো যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিল। তাঁর এই যাত্রা থেকে মনে হতে পারে, মনে হওয়া কেন, অনেকটা বোধহয় প্রমাণও হয়ে যায় প্রায়, তিনি ছিলেন বঙ্গদেশের বাসিন্দা। আবার তাঁর অভিযান-যাত্রার মধ্যে যেন মনে হয় সন্দ্বীপের কথাও আছে, সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে তিনি গিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গে। কিংবা ছিলেন সেখানেও। তখনকার ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে বহু পরিবার পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যার বাসিন্দা হয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পরিবার যেমন, প্রথমে উড়িষ্যা, পূর্ববঙ্গে, পরে পশ্চিমবঙ্গে। ঘনরামের বংশধর হিসেবে ঘনাদার সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মেরও যোগাযোগ থাকাই স্বাভাবিক।

ঘনশ্যাম দাস বর্ণে দ্বিজ হতে পারেন, ক্ষত্রিয় বংশেও তাঁর জন্ম হতে পারে। সওদাগরী জাহাজে সূক্ষ্ম বস্ত্র নিয়ে ঘনরামের ভৃগুকচ্ছে বাণিজ্য করতে যাওয়ার মধ্যে তাঁর বৈশ্য বংশজাত হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

লাতিন আমেরিকার দ্বীপ-নগর টেনচ্‌টিটলান-এ অ্যাজটেকদের হাতে বন্দী কর্টেজ আর তার মুষ্টিমেয় সৈন্য-বাহিনীকে উদ্ধার করেছিলেন 'গানাদো' ঘনরাম মস্তিষ্কের খেল্‌ দেখিয়ে। তিনি মন্ত্রের মতো আউড়েছিলেন বন্দী ডন কর্টেজকে শুনিয়ে শুনিয়ে—'তোমায় রথ দেখাব বলেই ভেবেছি, রথও দেখবে কলাও বেচবে।' তারপর সত্যিই রথ দেখিয়েছিলেন 'গানাদো' ঘনরাম। রথের মত কাঠের মোটা তক্তায় তৈরি দোতলা সাঁজোয়া গাড়ি। সে ঢাকা সাঁজোয়া গাড়ির দুই তলাতেই বন্দুক নিয়ে ছিল সৈনিকেরা। নিজেরা কাঠের দেওয়ালের আড়ালে তীর

বল্লম আর ইঁট পাটকেলের ঘা বাঁচিয়ে নিরাপদে বন্দুক ছুঁড়তে লাগল শত্রুর ওপরে। এই কাঠের সাঁজোয়া গাড়ির নাম হলো মান্টা।

সেই মান্টা উদ্ভাবিত না হলে কর্টেজ আর তার মুষ্টিমেয় বাহিনী সেবার দ্বীপ-নগর টেনচ্‌টিটলান থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারত না। নূতন আবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশের ইতিহাসই হয়তো তাহলে পাল্টে যেত।

কর্টেজ নিজের কথা রেখেছিলেন। গানাদোকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে দামী দামী বহু উপহার সমেত সম্রাটের সওগাত বয়ে নিয়ে যাওয়ার জাহাজেই স্পেনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পাঠাবার আগে দাসত্ব থেকে মুক্তিপত্র লিখে দেবার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এখন তুমি মুক্ত মানুষ গানাদো। বলো কি নামে তোমায় মুক্তিপত্র দেবো? কি নেবে তুমি পদবী?

নাম আমার নিজের দেশের ছেলেবেলার দেওয়া ঘনরামই লিখুন—বলেছিলেন গানাদো—আর আমার বংশ যদি ভবিষ্যতে থাকে তাহলে এ ইতিহাস চিরকাল স্মরণ করার জন্য পদবী দিন দাস।

সেই মুক্তিপত্র নিয়ে ঘনরামের কিন্তু আর স্পেনে পৌঁছনো সম্ভব হয় নি। সোরাবিয়ার চক্রান্তে তাঁকে আবার হতে হলো ক্রীতদাস। তারপর পিজারোর সঙ্গে দুঃসাহসিক অভিযানে পাড়ি দিলেন পেরুতে। সেখানেও ঘনরামের জয়জয়কার। সেখান থেকে ফিরে আসা। জাহাজের ডেকে মরণপণ সংগ্রাম ঘনরামের সঙ্গে সোরাবিয়ার। ঐ জাহাজের ডেকেই বন্দিনী কন্যা। ঘনরাম উদ্ধার করেছিলেন তাঁকেও।

তলোয়ার চালাতে চালাতে জাহাজের একেবারে শেষে দুজন। ঘনরাম তাঁর তলোয়ারের খোঁচায় কাটা পাল দিয়ে চাপা দিলেন সোরাবিয়াকে, সোরাবিয়া ডুবে মরল সমুদ্রে।

ঐ জাহাজের কাপতেন সানসেদো যাকে শ্রদ্ধাভরে মুক্তি দিয়ে গুরু বলে বরণ করেন ঋষিতুল্য পরম পণ্ডিত সেই বৃদ্ধ ভারতীয় জ্যোতিষীর অন্তিম লিপি গানাদো অর্থাৎ ঘনরাম দাস যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। কাটোয়ার কাছে ঝামটপুর নামে এক গ্রামে, কৃষ্ণদাস নামে এক সজ্জনের কাছে। সেই বৃদ্ধ জ্যোতিষী এই রকম কিছু লিখেছিলেন, ...গণনায় জানতে পারছি 1455 শকাব্দের আষাঢ় মাস সমস্ত পৃথিবীর এক দুঃসময়। বিশ্বের অন্যান্য এক যুগাবতার তিরোহিত হতে চলেছেন ঐ সময়ে। পারেন তো সেই পরম জ্যোতির্ময় সত্তার দীপ্ত দিব্যোন্মত্ত জীবনকথা অমর কাব্যে গেঁথে রাখবার চেষ্টা করুন। 1455 শকাব্দের আষাঢ় মাস হল 1533 খ্রীস্টাব্দের জুলাই। নীলাচলে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটে ঐ সময়েই।

যাক সে কথা, তাহলে দেখা যাচ্ছে দাস পদবী নিজেই নিলেন ঘনরাম। আর ঐ যে 'রথ দেখাব' বলেছিলেন তিনি বন্দী কর্টেজকে, তা থেকে একটা কথা বেরিয়ে আসে। ছেলেবেলায় দেখা রথের স্মৃতিই হয়ত ঘনরামকে উদ্বুদ্ধ করেছিল একথা বলার জন্যে। আর রথ মানেই তো উড়িষ্যা, জগন্নাথের বিখ্যাত রথ। সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে ঘনরামের ছোটবেলা হয়ত কেটেছিল উড়িষ্যাতেও। সেই রথযাত্রার স্মৃতি থেকেই তৈরি হলো দোতলা কাঠের সাঁজোয়া গাড়ি মান্টা—যা আধুনিক ট্যাঙ্কের পূর্বপুরুষ।

ঘনরামের কথা, ব্যবহার, ভেসে ওঠা স্মৃতি থেকে মনে হয় তিনি বঙ্গদেশ (পূর্ব এবং পশ্চিম), উড়িষ্যা আর মিথিলা—সমস্ত জায়গাতেই ছেলেবেলার কিছু কিছু অংশ কাটিয়েছেন। পূর্ব ভারতীয় সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে তাঁর জীবনের সঙ্গে। তিনি পূর্বভারতীয় সংস্কৃতির ফসল। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁর উত্তর পুরুষ ঘনশ্যাম দাস পূর্ব ভারতেরই মানুষ।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'ঘনাদা সংখ্যা' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত

অদ্বিতীয় ঘনাদার কয়েকটি বই

মঙ্গল গ্রহে ঘনাদা ১০·০০
ঘনাদা বিচিত্রা ২৫·০০
মৌ-কা-সা-বি-স ও ঘনাদা, ১৫·০০
ঘনাদার জুড়ি নেই ১০·০০
অদ্বিতীয় ঘনাদা ১৫·০০
ঘনাদা নিত্য নতুন ১৫·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ॥ ৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

ক্যামেরা

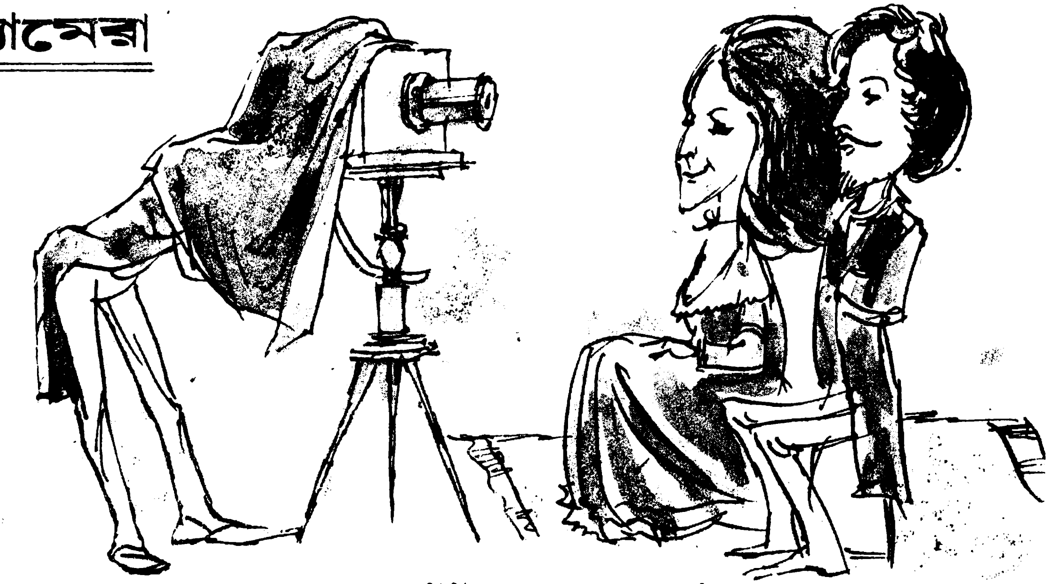

স্কুলে ভর্তি হয়েছে জিজা। আইডেনটিটি কার্ডের জন্য ওর ছবি তোলা হবে। তাই সকাল থেকেই সাজ গোজ ক'রে সমানে তাগাদা— "চলো না কাকু, চলো না কাকু।" ছটফটে জিজা গোঁফওয়ালা গম্ভীর ছবি তোলার লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে একটু ঘাবড়ে গেল। আমার জামার তলার দিকটা খামচে ধরে ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞেস করল, "কাকু কেমন করে ছবি তোলে গো? ছবি তুলতে গেলে কষ্ট হয়?" আমি ভ্রূ কুঁচকে একটু অবাক চোখে জিজার মুখের দিকে তাকালুম। —"কেন বলতো? "না, মৈনাক বলছিল যারা ছবি তুলে দেয় তারা খুব পাজি হয়; কাকু জানত আমার একটুও ভয় করছে না।" জিজার চোখের কোণে জল টলটল করছে। আমি হাতটা ধরে বললুম, "দূর বোকা, মৈনাক তোকে ভয় দেখিয়েছে। শুনবি কি ক'রে ক্যামেরায় ছবি তোলা হয়?" নিজেকে সামলাতে সামলাতে জিজা বলল, "শুনব।"

আঠারো শতাব্দীতে সুইডেনের এক রসায়নবিদ আবিষ্কার করেন কয়েক ধরনের রূপো যা যৌগ আলোর সংস্পর্শে প্রতিক্রিয়া করে। এরপর 1839 সালে লুই ডাগেয়ার নামের এক ফরাসী ভদ্রলোক প্রথম ছবি তোলেন। (অবশ্য 1835 সালে উইলিয়াম ফক্স ট্যালবট নিজের ক্যামেরা দিয়ে তার বাড়ি ল্যাকক অ্যাবেতে প্রথম ছবির নেগেটিভ তোলেন।) ছবি তোলার জন্য লুই সাহেব একটা বাক্স তৈরি করেন যে বাক্সের গায়ের একটা ছোট গর্ত দিয়ে ভেতরে আলো ঢুকতে পারে। তারপর একটা তামার পাতের ওপর সিলভার আয়োডাইড এর প্রলেপ লাগিয়ে বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন এবং বাক্সের গায়ের ফুটো দিয়ে ওই পাতটার ওপর আলো ফেলেন। এইভাবেই প্রথম যুগে ছবি তোলা হত। আর প্রলেপটা খুব কমজোরি হত বলে ছবি তুলতে অনেক বেশি সময় লাগত।

এখন ক্যামেরার মূল ব্যাপারটা আগেকারই মত তবে তা এখন অনেক বেশি উন্নত। আর তামার পাতের বদলে ব্যবহার হয় সেলুলয়েড।

গল্প বলা শেষ হতেই ঘরের ভেতর থেকে ছবি তোলার গম্ভীর লোকটা জিজাকে ডেকে বলল, "খুকি এইবার তুমি এস।"

খুকি ডাক শুনে জিজা বাঁকা চোখে তাকাল। ভঙ্গি দেখে মনে হলো, খুকি ডাকটা জিজার একদমই পছন্দ হয়নি।

আবিষ্কারক কলম্বাস

বাণীরূপ : অনিল কর্মকার/চিত্রায়ণ : গৌতম কর্মকার

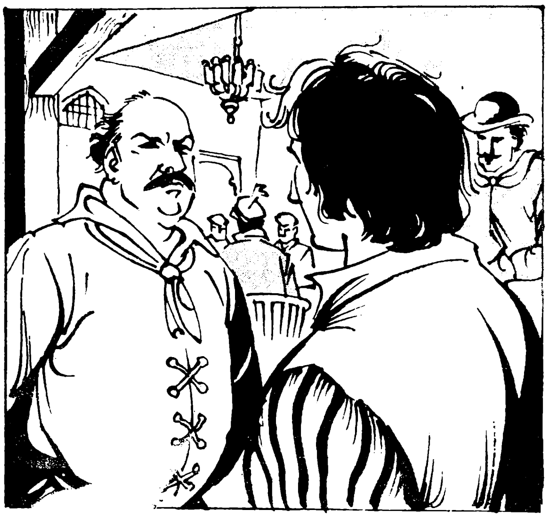

তাহলে উপায় ? আশাহত কলম্বাস আবার ফ্রান্সেই নতুন করে যোগাযোগের কথা ভাবলেন। কিন্তু কাউন্ট বললেন—না। বললেন– ধনে মানে উদ্যোগে আয়োজনে স্পেন আজ অনন্য। নব জাগরণের ঢেউ তুলেছেন রাজা ফার্দিনান্দ আর রাণী ইসাবেলা। আমি রাণীর কাছে আপনার বিস্তারিত পরিচয় দিয়ে এক অনুরোধ-পত্র পাঠাচ্ছি। আরও বিশাল এক আয়োজন নিয়ে আপনি বিজয়ের পথে এগিয়ে যান ক্রিস্টোফার।

গ্রানাডার জলাভূমিতে তখন যুদ্ধের দামামা বেজে চলেছে। রাজসভা বসছে এক নগরী থেকে আর এক নগরীর অনিশ্চয়তায়। রাজা-রাণীর অবসর কই ? কলম্বাসের মতো একজন অনামা নাবিকের স্বপ্নের পিছনে এক ঐতিহাসিক অভিযাত্রার জন্যে আলোচনা তাঁরা কেমন করে করবেন ? তবু ইসাবেলা তাঁকে বিমুখ করলেন না। করডোভায় আহূত রাজসভায় তিনি দেখা করবার জন্যে কলম্বাসকে ডাকলেন। খ্রীস্টাব্দ 1486। শীত শেষ হয়ে বসন্তের উষ্ণ হাওয়ায় পৃথিবী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আকাশে মাটিতে জলে বাতাসে নতুন জীবনের স্পন্দন। কলম্বাসের মনের জগতেও ঝর্ণার কলধ্বনি, নাকি রাতের সমুদ্রের বিস্তীর্ণ সুগভীর বিশ্বাস ? ছোট্ট দিয়িগোর হাত ধরে তিনি রাজসভার উদ্দেশে যাত্রা করলেন অপরিচিত করডোভায়।

কলম্বাস করডোভায় পৌঁছলেন, কিন্তু রাজা-রাণীর দেখা পেলেন না। গ্রানাডার জলাভূমিতে যুদ্ধের আগুন তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। ইসাবেলার নির্দেশে তাঁর প্রধান হিসাবরক্ষক অ্যালোনসো-ডি-কুইনটানিলা তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন রাজকীয় অতিথিশালায়। কলম্বাসের স্বপ্ন, তাঁর সংকল্প কুইনটানিলাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলো। তিনি মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন এই সুদূরপিয়াসী নাবিকটির দিকে। বিশ্বাস করলেন— কলম্বাস যা বলছেন সব অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। অনাবিষ্কৃত জলপথের দিকচিহ্ন যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন কুইনটানিলা। একে একে তাঁর সহকর্মী বন্ধুর দলও কলম্বাসের চারপাশ ঘিরে জড়ো হলেন। সবার উপরে কলম্বাস পেলেন তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের সাথী বিয়েত্রিজ এনরিকোর সান্নিধ্য। তাঁর একান্ত সমর্থক সুরূপা বান্ধবী। তাঁর দ্বিতীয় সন্তান ফার্ণান্ডোর জননী।

স্পেনের তখন এক টালমাটাল অবস্থা, তবু রাজা রাণী নিস্পৃহ বসে রইলেন না। কলম্বাসের পরিকল্পনার যথার্থতা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে বিশ্বতত্ত্ববিদ পণ্ডিত আর খ্যাতিমান নাবিকদের নিয়ে একটি কমিশন তাঁরা গঠনকরলেন ফ্রে হার্নাণ্ডো ডি তালাভেরার নেতৃত্বে।

আশায় স্বপ্নে কেটে চললো এক একটা দিন। আর কতো দিন, এখনো কতো কাল তাঁকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে ?

অবশেষে এলো 1487 খ্রীষ্টাব্দ। এবার রাজসভা বসবে সালামাংকায়। শুভানুধ্যায়ীদের চেষ্টায় এই প্রথম বার রাণী ইসাবেলার মুখোমুখি কলম্বাস দাঁড়ালেন। চল্লিশ বছরের উদ্বেলিত তরুণ নাবিক বিশ্বতত্ত্ববিদ কলম্বাস এবার ছবির পর ছবি রচনা করে চললেন ইসাবেলার সামনে।

পৃথিবী এক সুবৃহৎ গোলক। স্থলপথে তার পশ্চিম সীমান্ত স্পেন থেকে পূর্বসীমান্ত ভারতবর্ষ—বহু বহু দূরে। অতএব সমুদ্রপথে স্থলপথের বিপরীতমুখী জলযাত্রায় সোনার ভারতবর্ষ অনেক অনেক নিকটে।

হাতে আঁকা পৃথিবীর ছবি দিয়ে কলম্বাস দেখালেন—স্পেন থেকে ভারতবর্ষের কৌণিক দূরত্ব 282°, অতএব জলপথে তার পরিমাপ মাত্র 78°। স্থলপথের দূরত্বের প্রায় সিকিভাগ বললেও চলে। তার উপর স্থলপথ চলে এঁকেবেঁকে পাহাড় পর্বত নদী নালা এড়িয়ে। আর জলপথ—জাহাজ ভেসে যাবে উদ্দাম গতিতে সুস্পষ্ট নিপুণ লক্ষ্যে, এক সুনিয়ন্ত্রিত সরলরেখায়। বাঁচবে অনেক ক্লেশ, অনেক সময়। স্বর্ণময় ভারতের ছোঁয়া পেয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে স্পেনের জীবন। উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তার ধনাগার।

ইসাবেলার চোখের সামনে অনাবিষ্কৃত সমুদ্রপ যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তবু তিনি রাণী নিয়োজিত কমিশনের পরামর্শ উপেক্ষা করে আপ বিশ্বাসে এগিয়ে গেলে তার চলে না। তি যা পারেন তা এই অসমসাহসী দুরাকাঙ্খী যুবকটি জীবনযাপনকে আরও স্বাচ্ছন্দ করে তুলতে। অনটনে ক্লেশ থেকে তার স্বপ্নের সব নদীগুলিকে অবলীলা বাঁচিয়ে রাখতে। সম্মানের গৌরবে তার স্বপ্নগুলিকে বলীয়ান করতে। তিনি ঘোষণা করলেন—কমিশনে সিদ্ধান্ত যতদিন না আসে, ততদিন রাজকোষ থেকে কল ম্বাসের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা হবে। রাজ সভায় অনুগামী হয়ে এক নগরী থেকে আর এক নগর তিনি পরিভ্রমণ করবেন এক রাজকীয় অতিথি মর্যাদায়।

দীর্ঘ চার বছর কেটে গেল অসীম ধৈর্যে। কিন্তু সব বাধ ভেঙে দিল কমিশনের রায়। তালাভেরা কমিশন নিষ্ঠুরভাবে ঘোষণা করলো—কলম্বাসের পরিকল্পন ভ্রান্ত, অভিযান অর্থহীন।

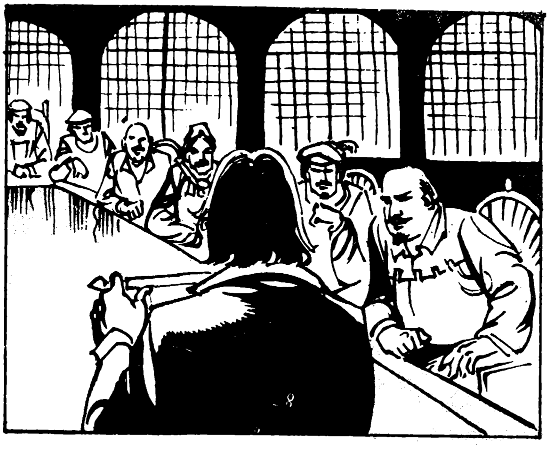

(ক্রমশ

পাতা পোকা

ইংরাজী নাম লিফ-ইনসেক্ট, বাংলায় পাতা-পোকা। বৈজ্ঞানিক নাম ফাইল্লিয়াম সিক্কিফোলিয়াম (Phyllium Siceifolium)। এই পাতা পোকারা কাঠি পোকার জ্ঞাতি। order হল ফাসমিডা (phasmida), গ্রীক শব্দ, যার মানে হল, ভীতি সঞ্চারক মূর্তি।

এই পাতা-পোকাকে দেখতে একেবারে পাতার মত। বোঝাই যায় না। মনে হবে একটা পাতা পড়ে আছে। হাত দিলেই নড়ে উঠে চলতে শুরু করে। আর এরকম ঘটনা ঘটলে ভয় পাবেই কেউ না কেউ।

সবুজ বাদামী রঙের মিশ্রণে বিভিন্ন রকম ভাবে রঙীন হয় এই পাতা-পোকারা। দক্ষিণ ইওরোপের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই দেখতে পাওয়া যায় এদের। এরা মূলতঃ নিশাচর। দিনের বেলা স্থির পাতার মত পড়ে থাকে, বোঝাই যায় না। আজকাল আবার অনেকে এই পাতা-পোকা পোষে। চলন্ত পাতা, মজার ব্যাপার তাই না ?

অলয় ঘোষাল

নিওন অমরনাথ রায়

পর্যায় সারণীর দশ নম্বর মৌলটির নাম 'নিওন (NEON)। এই মৌলটির চিহ্ন Ne, পারমাণবিক গুরুত্ব = 20·183, স্ফুটনাংক = – 246°C, গলনাংক = – 248.6°C, O°C উচ্চতায় নিওন মৌলটির ঘনত্ব = 0.899 গ্রাম / লিটার।

গ্রীক শব্দ Neos মানে নতুন। এই 'নিওস' শব্দ থেকেই 'নিওন' নামটা এসেছে। নিওন হলো নিষ্ক্রিয় গ্যাস শ্রেণীর মৌল। বায়ুতে এই মৌলটিকে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। সাধারণ অর্থে নিওনের কোন যৌগ সৃষ্টির ক্ষমতা নেই। তাই এর যোজ্যতাও শূন্য। পর্যায় সারণীর দ্বিতীয় পর্যায়ের শূন্য শ্রেণীতে নিওনের অবস্থান। এই নিষ্ক্রিয় মৌলটির চিহ্ন Ne এবং একে $_{10}Ne^{20.183}$ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যদিও ভূত্বকে 5×10^{7}% নিওন আছে তবুও বায়ুই হলো নিওনের বাণিজ্যিক উৎস। বায়ুর প্রতি দশ লক্ষ ভাগের মধ্যে 18·18 ভাগ নিওন বর্তমান। কিছু কিছু খনিজে, প্রাকৃতিক গ্যাসে, উল্কার পাথরে এবং ঝরণার জলেও নিওন পাওয়া যায়। আবার কিছু কিছু মৌল আছে, যাদের উপর আলফা (α) কণার আঘাতে নিওন উৎপন্ন হয়। দৃশ্যমান মহাজগতেও নিওন আছে, তবে প্রকৃতিতে এই মৌলটির কোন তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক নেই।

1898 খ্রীস্টাব্দের কথা। নোবেলজয়ী স্কটিশ রসায়নবিদ স্যার উইলিয়ম র‍্যামজে এবং M. W. Travers তরল বায়ুর লঘু অংশ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে একটি নতুন নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কার করে ফেলেন। স্যার র‍্যামজের বারো বছর বয়স্ক পুত্র ঐ নতুন গ্যাসটির নাম 'নিওন' রাখার প্রস্তাব দেন এবং তা গৃহীতও হয়। নিওনের আবিষ্কার তারিখ 7 জুন, 1988। সে দিন অবশ্য স্যার র‍্যামজে উপস্থিত ছিলেন না। তাই ট্রাভার্স একাই পরীক্ষা করছিলেন। এরপর অবশ্য পুরো এক সপ্তাহ কেটে যায় — পরীক্ষালব্ধ ফলগুলিকে যাচাই করতে, অধিক পরিমাণ নিওন সংগ্রহ করতে এবং নিওনের ঘনত্ব নির্ণয় করতে। তখনও নিওনকে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংগ্রহ করা যায় নি। নিওন ও আরগনকে পৃথক পৃথক ভাবে সংগ্রহ করার সমস্যার সমাধান হয় পরবর্তীকালে।

নিষ্ক্রিয় মৌলের বর্ণালী পরীক্ষা করেই নিওন মৌলটিকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। স্যার র‍্যামজে ও ট্রাভার্স বায়ু থেকে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন দূর করে যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহ পড়ে থাকে, তাদের প্রথমে তরলে পরিণত করে আংশিক প্রক্রিয়ায় নিওনকে পৃথক করতে সক্ষম হন। আজকাল অবশ্য তরলবায়ু থেকে নাইট্রোজন ও অক্সিজেনকে পৃথক করার পর হিলিয়াম ও নিওনকে সক্রিয় অঙ্গারের উপর বিশেষ চাপে ও উষ্ণতায় শোষণ করিয়ে পৃথক করা হয়। এ ভিন্ন নিষ্ক্রিয় গ্যাস মিশ্রণকে তরল হাইড্রোজেন দিয়ে শীতল করে নিওনকে আংশিক তরল করে পৃথক করাও হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—নিওন কেমন মৌল ?—এটি বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন গ্যাসীয় পদার্থ। এর একটি অণুতে একটিমাত্র পরমাণু বিদ্যমান। তার মানে নিওন হচ্ছে এক পরমাণুক মৌল। এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 10.5 মিলি লিটার নিওন 20°C উষ্ণতা এক লিটার জলে দ্রবীভূত হয়। প্রকৃতি হতে যে নিওন সংগ্রহ করা হয়, তার 20, 21 এবং 22 ভরসংখ্যা বিশিষ্ট তিনটি সমস্থানিক আছে।

কোনও বাল্বে বা নলের ভিতরে কম বায়ু চাপে রেখে তার মধ্যে নিওন গ্যাস পূর্ণ করলে সেই বাল্ব বা কাচ নল কমলালেবু বর্ণের আলো নির্গত করে। রাত্রিবেলায় নিওন বাতি বিমান বন্দরে, ব্যবহৃত হয়। আবার পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিওন বাতি (নিওন সাইন) দ্বারা রাত্রিবেলায় প্রচার করা হয়। এ ছাড়া নিওনকে রেফ্রিজারেট রূপে ব্যবহার করা হয়। গভীর জলে ডুবুরীরা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে অক্সিজেনের সঙ্গে নিওন গ্যাসও ব্যবহার করে থাকেন। আবার পরমাণুর কেন্দ্রীণ কণিকার গতিবিধি লক্ষ্য করার কাজেও নিওন পূর্ণ স্পার্ক চেম্বার ব্যবহৃত হয়। এ ভিন্ন গাইগার মুলার কাউন্টারে, সেফটি ল্যাম্পে ও স্পার্ক প্লাগ টেস্ট ল্যাম্পে নিওন ব্যবহৃত হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

1. একশো তিনটি মৌলিক পদার্থ By কানাইলাল মুখোপাধ্যায়
2. Chemical elements by D. N. Trifonov and V. D. Trifonov.

বল ও তার প্রকৃতি

সমীরকুমার ঘোষ

দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা ধরনের বলের সঙ্গে পরিচিত। বল ও তার প্রয়োগ বিজ্ঞানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 1687 খ্রীস্টাব্দে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন (1642-1727), তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রিন্সিপিয়া'তে গতিসংক্রান্ত তিনটি সূত্র বিবৃত করেন। এই সূত্রগুলির সাহায্যেই বলের সংজ্ঞা ও তার পরিমাপের একটা ধারণা পাওয়া যায়। যে শক্তি বস্তুকে গতি দেয় তার ব্যাখ্যা, যে শক্তি গতিশীল বস্তুকে থামিয়ে দেয় তার ব্যাখ্যা বা তাদের বেগের হার ও গতির দিক ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা এই সূত্রগুলি থেকে পাওয়া যায়। আসলে বল হ'ল এমন একটি জিনিস যা বাইরে থেকে প্রয়োগ করে। বস্তুর স্থির অথবা সমবেগে সরলরেখায় গতিশীল অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যায় বা ঘটানোর চেষ্টা করা যায়। এই বলকেই বলা হয় Force এবং ইহা একটি ভেক্টর রাশি। বস্তুতঃ সারা পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনাই পদাথের উপর শক্তির ক্রিয়ার ফলস্বরূপ। যে কোন পদার্থের মধ্যে শক্তির উদ্ভব হ'লে, তা অন্যান্য বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করতে পারে। পদার্থের উপর বলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও তার ফল বিজ্ঞানের যে বিভাগে আলোচনা করা হয় তার নাম 'বল-বিদ্যা বা Mechanics.

নিউটনের তিনটি গতিসূত্রের প্রথমটি থেকে বলের সংজ্ঞা ও দ্বিতীয়টি থেকে বলের পরিমাপ পাওয়া যায়। বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল ঐ বস্তুর ভর ও বস্তুর ত্বরণের (বা মন্দনের) গুণফলের সমান। যে পরিমাণ বল একক ভরবিশিষ্ট বস্তুর উপর কাজ করে একক ত্বরণ সৃষ্টি করতে পারে, সেই বলকেই একক বল বলা হয়। যদিও ভর একটি স্কেলার রাশি, কিন্তু ত্বরণ একটি ভেক্টর রাশি বলে, বলও একটি ভেক্টর রাশি। বিভিন্ন পদ্ধতিতে বলের একক ভিন্ন। যেমন সি. জি. এস. পদ্ধতিতে বলের একক 'ডাইন', এফ. পি. এস পদ্ধতিতে 'পাউণ্ডাল' এবং এম. কে. এস. পদ্ধতিতে 'নিউটন,' এগুলি ছাড়া যে বলের দ্বারা একক ভরের বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হয়। সেই বলকে অভিকর্ষীয় পদ্ধতিতে একক বল বলে এবং এর পরিমাপ গ্রাম-ভার (gm-wt)। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, বেশি মানের একটি বল, খুবই অল্প সময়ের জন্য একটি বস্তুর উপর কাজ করে। এই ধরনের অতি স্বল্পস্থায়ী বৃহৎ বলকে 'ঘাত বল (Impulsive Force) বলে। ক্যারামের ঘুটিকে যখন একটি স্ট্রাইকার দিয়ে আঘাত করা হয় বা ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে যখন বলকে আঘাত করা হয়, তখন যে বল কাজ করে তাকে ঘাত বল বলা যেতে পারে।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন ধরনেরবলের অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রতিটি বলের প্রকৃতি, ধর্ম ও পরিমাপও ভিন্ন ধরনের। বিজ্ঞানী নিউটন তাঁর 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থে এক সার্বজনীন (universal) বলের কথা প্রকাশ করেন, যা 'মহাকর্ষীয় সূত্র (Law of gravitation) নামে সুপরিচিত। এই সূত্র অনুযায়ী, বিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা অপর যে কোন বস্তুকণাকে একটি বলের দ্বারা নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণ বল কণা দুটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং তাদের মধ্যকার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। নিউটন কথিত মহাকর্ষীয় বলের এই সূত্র অনুযায়ী 'M' ও 'm' ভর-বিশিষ্ট দুটি বস্তু যদি 'R' সেমি ব্যবধানে থাকে। তাহলে ঐ বস্তুদুটির মধ্যে অভিকর্ষীয় বলের পরিমাণ হবে $F = G.\frac{Mm}{R^2}$। এই সমীকরণে G একটি ধ্রুবক যার মান সি. জি. এস. এককে $6{\cdot}6 \times 10^{-8}$, এবং এই ধ্রুবকটিকে বলা হয় 'মহাকর্ষীয় ধ্রুবক', প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, এই অভিকর্ষীয় বল সবসময়েই একটি আকর্ষণী বল এবং সৌর মণ্ডল, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি সকলের গতিবিধিই এই সূত্র মেনে চলে।

প্রকৃতিতে মোটামুটি চারটি মুখ্য বল আছে বলে মনে করা হয়। সেগুলি হ'ল যথাক্রমে (i) মহাকর্ষীয় বল (gravitational force) (ii) তড়িৎচুম্বকীয় বল (electromagnetic force), (iii) নিউক্লিয় বল (nuclear force) ও (iv) দুর্বল বল (weak interaction)। এগুলির মধ্যে মহাকর্ষীয় বলের কথা আগেই বলা হয়েছে তবে পারমাণবিক বা উপ-পারমাণবিক ক্ষেত্রে, এই মহাকর্ষীয় বলের পরিমাণ খুব কম এবং সেক্ষেত্রে অন্যান্য ধরনের বলের প্রভাব অনেক বেশি।

তড়িচ্চুম্বকীয় বা 'ক্যুলম্ব বল' আহিত (charged) বস্তুকণার মধ্যে বিরাজ করে। এই বল আহিত বস্তুগুলির আধানের প্রকৃতির (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক) উপর নির্ভর করে এবং সেইমত বল আকর্ষী বা বিকর্ষী বলহিসাবে কাজ করে। এই বলের দুটি প্রধান উপাদান হ'ল, চৌম্বক ক্ষেত্র ও বৈদ্যুৎ ক্ষেত্র (magetic and electric)। পরমাণুর ভিতরকার ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে এই বলই একমাত্র মুখ্য বল। প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এরকম আরো অনেক ধরনের বলকেই এই তড়িচ্চুম্বকীয় বলের শ্রেণীতে ফেলা যায়—যেমন, রাসায়নিক

(chemical) বল যা অণুর মধ্যে পরমাণুগুলিকে ধরে রাখে ; আসঞ্জন ও সংসঞ্জন (adhesive ও cohesive) বল ; স্থিতিস্থাপকীয় (elastic) বল ; ঘর্ষণ (frictional) বল ইত্যাদি ।

'নিউক্লিয় বল' একটি প্রবল আকর্ষণী বল কিন্তু স্বল্প-দূরত্বীয় পরমাণুর কেন্দ্রকের ভিতর এই বল কার্যকারী এবং এই বলের প্রভাবেই কেন্দ্রকের মধ্যে কেন্দ্রক কণাগুলি (nucleous) একত্র বাঁধা থাকে। এই বল 4×10^{-13} সেমি দূরত্বে প্রায় কার্যশূন্য হয়ে পড়ে এবং সাধারণ আকারের একটি কেন্দ্রকের ক্ষেত্রে, এই বল প্রোটনের মধ্যে কার্যকরী বিকর্ষী তড়িচ্চুম্বকীয় বলকে অতিক্রম করে। এই বল আধানের প্রকৃতির উপর নির্ভশীল নয় এবং তড়িচ্চুম্বকীয় বলের তুলনায় এই বল প্রায় 100 গুণ বেশি শক্তিশালী।

'দুর্বল বল' সাধারণতঃ নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয়তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং মৌলিক কণার শ্লথ ভাঙ্গনের (decay) কারণ হিসাবে এই বলকে গণ্য করা যেতে পারে। এই বলের পরিমাণ তড়িচ্চুম্বকীয় বলের তুলনায় অনেক কম। মানের দিক থেকে এই সবগুলি বলের মধ্যে নিউক্লিয় বলই সব-চেয়ে শক্তিশালী বল আর মহাকর্ষীয় বল সবচেয়ে দুর্বল মানের বল। দুটি ইলেকট্রন যদি একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মহাকর্ষীয় বল ও তড়িচ্চুম্বকীয় বলের অনুপাত হবে $2{\cdot}4 \times 10^{-43}$ আর দুটি প্রোটনের ক্ষেত্রে এই অনুপাতের মান হবে 8×10^{-37}। বস্তুর 'দুর্বল বলের তুলনায় তড়িচ্চুম্বকীয় বল প্রায় 10^{12} গুণ বেশি আবার 'দুর্বল বল' মহাকর্ষীয় বলের চেয়ে প্রায় 10^{25} গুণ বেশি।

এই চারিটি মুখ্য বল ছাড়াও, প্রকৃতিতে আরো নানা ধরনের বলের অস্তিত্ব দেখা যায়। যেমন, ঘূর্ণায়মান কোন বস্তুর ক্ষেত্রে অভিকেন্দ্র (centripetal) ও অপকেন্দ্র (Centrifugal) বলের উপস্থিতি দেখা যায়। অবশ্য, এই বলগুলি কোন বস্তুর একটি বিশেষ অবস্থায় (আবর্ত-গতিতে) অনুভব করা যায়। প্রসংগতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে আবর্তগতিতে উৎপন্ন অভিকেন্দ্র বল একটি বাস্তব (real) বল কিন্তু অপকেন্দ্র (Centrifugal) বল বাস্তব বল নয়। কারণ, স্থির নির্দেশতন্ত্র থেকে কোন বস্তুর গতি দেখলে, অপকেন্দ্র বলেয় অস্তিত্ব বোঝা যায় না। সেজন্য, অপকেন্দ্র বলকে অনেক সময়ে 'অলীক বল' (Pseudo force) বলা হয়।

সুতরাং প্রকৃতিতে যে বিভিন্ন ধরনের বলের সংগে আমরা নিত্য পরিচিত হই, তাদের প্রকৃতি ও ধর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা পাওণা গেল বলে মনে করা যেতে পারে।

জ্ঞান বিজ্ঞানের বই

হাতে কলমে বিজ্ঞান চর্চা

অমরনাথ রায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর অজয় চক্রবর্তী নাম কে না জানে। তিনি শুধু যে পাঠ্য পুস্তক লিখেই যশস্বী হয়েছেন, তা নয়। ছোটদের জন্যে লেখাতেও তিনি যে সিদ্ধ হস্ত তারও নিদর্শন রেখেছেন আলোচ্য গ্রন্থখানিতে এবং 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার একাধিক সংখ্যায়।

বই, বিশেষ করে বিজ্ঞানের বই কণ্ঠস্থ করলেই বিজ্ঞান শেখা যায় না। নিজে হাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে যাচাই করে নিতে হয়। তবেই বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আসক্তি জন্মে। এবং তা বাল্যকাল থেকেই হলে ভাল হয়।

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই অজয়বাবু আলোচ্য গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। এবং উদ্দেশ্য দারুণভাবে সফল হয়েছে। বিজ্ঞানী হতে গেলে কেমনতর হতে হয়, কোন্ কোন্ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় কোন্ কোন্ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হয়—ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শুরু লেখক একে একে 50টিরও বেশি চমৎকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সচিত্র বিবরণ দিয়ে গেছেন যে পরীক্ষাগুলি করতে গেলে ব্যয় সাপেক্ষ যন্ত্রপাতি বা উপকরণের প্রয়োজন হয় না।

পরীক্ষাগুলিকে লেখক প্রধানত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। বায়ুর চাপ সংক্রান্ত পরীক্ষা, জল নিয়ে পরীক্ষা, বরফ নিয়ে পরীক্ষা বল বিজ্ঞান সম্পর্কিত পরীক্ষা ও অজস্র চিত্র সম্বলিত বলে পাঠক বর্গের কাছে খুবই মনোগ্রাহী হবে।

'হাতে-কলমে গণিত' গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক অরূপ-রতন ভট্টাচার্য ঠিকই বলেছেন, 'গণিতকে হাতে কলমের চৌহদ্দীর মধ্যে নিয়ে আসা সহজ কাজ নয়'—অথচ গ্রন্থটি পাঠে বোঝা যায় যে অরূপ বাবু সেই অসাধ্য কাজটিই নিপুণ

ভাবে করেছেন। অরূপবাবুর এইটিই কৃতিত্ব। পেশায় গণিতের অধ্যাপক। তার উপর রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক। অভিজ্ঞ শিক্ষক যে ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন নতুন বিষয় শিক্ষা দেন, অরূপবাবু নীরস গণিতকে সরস করে তা শুধু ছাত্র-ছাত্রীদেরই নয় সাধারণ মানুষকেও বুঝিয়েছেন অনেক চিত্র মাধ্যমে।—এইটাই অরূপবাবুর কৃতিত্ব। অনুজপ্রতিম দুলাল বল অতি যত্ন সহকারে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন। আশা করব—এই গ্রন্থখানি শুধু ছাত্র-ছাত্রীই নয়, বিজ্ঞান পিপাসু সাধারণ বয়স্কদেরও আনন্দ দেবে।

'রসায়ন' এমন একটি বিজ্ঞান যা সত্যিকারের রসের আকর এবং সে রসাস্বাদন করা তখনই সম্ভব, যখন বাড়িতে বা পরীক্ষাগারে গিয়ে এর সুন্দর সুন্দর পরীক্ষাগুলি ছেলে-মেয়েরা নিজে হাতে করার সুযোগ পায়।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক রসায়ন বিজ্ঞানের প্রায় 44টি সহজ-সরল পরীক্ষার চিত্র বিবরণ দিয়েছেন। এর মধ্যে অনেক পরীক্ষার কথাই পাঠ্য পুস্তকে আছে। তবে বেশ কিছু পরীক্ষার কথাই পাঠ্য পুস্তকে আছে। তবে বেশ উল্লেখ আছে, যা পাঠ্য পুস্তকে পাওয়া যাবে না; যেমন 39 পৃষ্ঠার 'রূপোর পুতুল' 79 পৃষ্ঠার 'টেস্টটিউব আয়না'। বইটি সুলিখিত হলেও বেশ কিছু ছাপার ভুল রয়ে গেছে। যেমন 74 পৃষ্ঠায় যে মলম ঘা সাড়ায়, 'সাড়ায়' ভুল। ওটা হবে 'সারায়'। গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখক পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে এই গ্রন্থটি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যেই বিশেষ ভাবে লেখা। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। গ্রন্থের শেষে লেখক একটি মূল্যবান অধ্যায় সংযোজন করেছেন এবং সেটি হলো সম্ভব্য দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার। এ ভিন্ন বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রয়োজন হবে, এমন সব উপকরণ কোন্ কোন্ দোকান থেকে কিনতে পাওয়া যাবে—গ্রন্থকার তাদের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করেছেন গ্রন্থের শেষে প্রচ্ছদ।

স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা জীবন বিজ্ঞান পড়ে। জীবন বিজ্ঞানের অনেক পরীক্ষার বিবরণও তারা বইতে পড়ে। কিন্তু কম ছাত্র-ছাত্রীই একেবারে নীচু ক্লাশ থেকে জীবন বিজ্ঞানের পরীক্ষাগুলি হাতে কলমে করে দেখার সুযোগ পায়। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক জীবন বিজ্ঞানের 145টি পরীক্ষায় কি কি উপকরণ লাগবে, কি ভাবে পরীক্ষা করতে হবে এবং সবশেষে ঐ পরীক্ষা হতে কি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে লেখক তা জানিয়ে দিয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে-কলমে পরীক্ষা করতে করতে উৎসাহিত করাই এই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য ফলপ্রসু হতো বলেই মনে করি। কিন্তু বইটিতে অনেক ছাপার ভুল রয়ে গেছে। প্রথম পৃষ্ঠার water শব্দটি অস্পষ্ট, তৃতীয় পৃষ্ঠার Epigel শব্দটিও অস্পষ্ট। পৃষ্ঠা 4 এর ছবির নীচের লেখা রয়েছে 'মৃতভেদী'। ওটা হবে 'মৃৎভেদী' 28 পৃষ্ঠায় পরীক্ষার স্থলে ছাপা হয়েছে "পরক্ষা' 40 পৃষ্ঠায় চুন জলের সংকেত লেখা হয়েছে CaoP কিন্তু ওটা হবে Ca (oH) একটু যত্ন সহকারে প্রুফ দেখলে এ ধরনের ভুল হতো না। তবুও বলব, এ ধরনের গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল।

আধুনিক বিজ্ঞানে 'ইলেকট্রনিস' একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা রূপে বিবেচিত হয়। টেলিভিশন, কমপিউটার যন্ত্রমানব ইত্যাদি ইলেকট্রনিক্সেই অবদান। অথচ সাধারণ মানুষের পক্ষে বিজ্ঞানের এই শাখাটিকে বোঝা বেশ কঠিন ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, বিজ্ঞানে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা বা বিজ্ঞানে ডিগ্রীধারী ছাত্র-ছাত্রীরা এই বইটি পড়ে যথেষ্ট উপকৃত হবে।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন, ইলেকট্রনিকস্ কি? দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইলেকট্রনিকস্ এর গোড়ার কথা, তৃতীয় অধ্যায়ে উপকরণ সংগ্রহ চতুর্থ অধ্যায়ে প্রজেকট তৈরি করা এবং পঞ্চম ও শেষ অধ্যায়ে অনেকগুলি প্রজেক্ট তৈরির কৌশল শিখিয়েছেন প্রজেক্ট তো খুবই চিত্তাকর্ষক। প্রতিটি প্রজেক্টে কি কি উপকরণ প্রয়োজন তা লেখক জানিয়ে দিয়েছেন এবং প্রতিটি প্রজেক্টের সঙ্গে চিত্র সংযোজন করেছেন। অটোমেটিক সাইরেন, ইলেকট্রনিক তুলাদণ্ড ইত্যাদি প্রজেক্টগুলি ছাত্র-ছাত্রীরা নিজে হাতে বানাতে পারলে অনাবিল আনন্দ পাবে। এমন এক জটিল বিজ্ঞানকে সহজভাবে প্রকাশ করার প্রচেষ্টার জন্য লেখককে সাধুবাদ জানাই।

কিছু কিছু ছাপার ভুল রয়েছে। প্রচ্ছদ চলনসই সবকটি গ্রন্থেরই প্রকাশক—শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ।

হাতে কলমে ইলেকট্রনিকস্
রত্নেশ্বর রায় ॥ 12.00

হাতে কলমে পদার্থ বিজ্ঞান
অজয় চক্রবর্তী ॥ 12·00

হাতে কলমে গণিত
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ 12·00

হাতে কলমে রসায়ন
কমল চক্রবর্তী ॥ 12·00

হাতে কলমে জীবন বিজ্ঞান
দিনোজকুমার দে ॥ 12·00

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ 8/1A, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা—73

মানুষের সব ধরনের কাজের জন্যে দরকার শক্তি। কলকারখানা চলে শক্তিতে, যানবাহন চলার জন্যে শক্তি চাই, চাষবাসের জন্যে দরকার শক্তির; রান্নাবান্নার জন্যেও শক্তি প্রয়োজন। গায়ে-গতরে খেটে আমরা যতটা কাজ করি, তার চেয়ে ঢের বেশি শক্তি পাওয়া যায় নানা ধরনের জ্বালানি থেকে। আমাদের আশেপাশে এমনি জ্বালানির দৃষ্টান্ত হল কাঠ, পাটখড়ি, গাছের পাতা, ডাল-পালা, খড় এমনি সব উদ্ভিজ্জ বস্তু।

গত দুশো বছর ধরে উন্নত দেশগুলোতে শিল্পায়ন খুব দ্রুতগতিতে এগিয়েছে। তার ফলে উৎপাদন বেড়েছে বহুগুণে, মানুষের জীবনে নানা ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। এর পেছনে অনেক ঘটনা কাজ করেছে। তার মধ্যে একটি বড় ঘটনা হল এই সময়ে মানুষ বিপুলভাবে খনিজ জ্বালানি ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কয়লা, কেরোসিন, পেট্রল, ডিজেল, গ্যাস এসব হল এমনি খনিজ জ্বালানি।

এককালে বনের কাঠ জ্বালিয়ে লোকে রান্নাবান্না করত; কলকারখানাও চলত কাঠের আগুনে। কিন্তু দেখা গেল পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনি কমে আসছে বনের এলাকা। এমন কি মানুষের ঘর-বাড়ি তৈরির জন্যে যে কাঠের দরকার তা যোগাড় করাই আজ ক্রমে ক্রমে কঠিন হয়ে উঠছে।

আজ আরো দেখা যাচ্ছে মাটির তলা থেকে যে সব খনিজ বস্তু তুলে এতদিন মানুষের জ্বালানির প্রয়োজন মেটানো হচ্ছিল তার পরিমাণও অফুরন্ত নয়। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলছেন আগামী ত্রিশ-চল্লিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর তেল আর গ্যাসের ভাণ্ডার নিঃশেষ হবে; কয়লার সরবরাহও ফুরিয়ে যাবে দু'তিনশ বছরের মধ্যে।

তাহলে এরপর মানুষের শক্তি কোথা থেকে জুটবে?—এই সংকটজনক অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষের দৃষ্টি পড়েছে নতুন নতুন শক্তির উৎসের দিকে। তার মধ্যে দু'টি প্রধান উৎস হল জৈববস্তু ও সৌরশক্তি। বিশেষ করে পৃথিবীর উষ্ণমণ্ডলীয় দেশগুলোতে এ ধরনের শক্তির ব্যবহার গত ক'বছরের মধ্যে ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

আসলে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ থেকে পাওয়া যে কোন জিনিসই জৈববস্তু। তার মধ্যে কাঠ, নাড়া, ভুষি, গোবর—এমনি অনেক জিনিস পড়ে। আজকাল বিজ্ঞানীরা নানা উপায়ে নতুন নতুন ধরনের জৈববস্তু উৎপাদনের পদ্ধতি

আবিষ্কার করছেন। তার মধ্যে একটি হল বায়োগ্যাস (জৈব গ্যাস) বা গোবর গ্যাস।

বায়োগ্যাসের কথা নিয়ে কিছুদিন থেকে বেশ আলোচনা হচ্ছে। গরু-মোষ-ছাগলের গোবর-চোনা, মানুষের মলমূত্র, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, কচুরিপানা, ঘাস ইত্যাদি পচনশীল আবর্জনা আবদ্ধ পাত্রে রেখে দিলে সূক্ষ্ম অণুজীবের ক্রিয়ায় কিছুদিন পর তা থেকে মিথেন গ্যাস তৈরি হয়। এইটা হল বায়োগ্যাস বা জৈব গ্যাস। এই গ্যাস নলের সাহায্যে ঘরে নিয়ে জ্বালালে তা থেকে রান্না-বান্নার জন্যে তাপ বা রাতে অন্ধকার তাড়াবার জন্যে আলো পাওয়া যেতে পারে। জৈব গ্যাস তৈরির একটা সুবিধে হল, গ্যাস বেরিয়ে আসার পর নিচে যে তলানি বস্তু পড়ে থাকে তা খুব ভাল সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কাজেই গোবরকে বায়োগ্যাস বা জৈবগ্যাস তৈরির জন্যে ব্যবহার করা হলে তাতে খেতে দেবার জৈব সারের কোন ঘাটতি পড়ে না।

বদ্ধপাত্রে যে সব অণুজীবের ক্রিয়ায় জৈব বস্তু গেঁজে গিয়ে জৈব গ্যাস তৈরি হয় তারা ভালভাবে কাজ করে ২৫ থেকে ৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতায়। এ জন্যেই উষ্ণ-মণ্ডলীয় দেশগুলিতে জৈবগ্যাস ব্যবহার বেশ সুবিধেজনক ; আবার এ সব দেশেও সচরাচর শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্ম-কালেই জৈবগ্যাস পেতে বেশি সুবিধে।

বাংলাদেশে সত্তরের দশকের শুরুতে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈবগ্যাস তৈরি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। তারপর বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদে এ নিয়ে বেশ কাজ হয়েছে। এই পরিষদ এবং পরিবেশ কলুষতা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের উদ্যোগে দেশের নানা অঞ্চলে অনেকগুলো জৈব-গ্যাস তৈরির আধার বসানো হয়েছে। চীন ও ভারতে খুব ব্যাপক আকারে এই জ্বালানি ব্যবহার করা হয় ; বাংলাদেশ এবং আরো অনেক দেশে এর ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশগুলোতে সূর্য থেকে বিপুল পরিমাণ আলো আর তাপ এসে পড়ে। বাংলাদেশে এবং ভারতের অনেক অঞ্চলে প্রতি বর্গমিটার জায়গায় সারা বছরে যে পরিমাণ সূর্য কিরণ পড়ে তা গ্রেট ব্রিটেনে সমান এলাকায় পড়া সূর্যকিরণের চেয়ে প্রায় পাঁচগুণ বেশি। এভাবে আমাদের সারা বছরের শক্তি চাহিদার চেয়ে অনেক গুণ বেশি শক্তি আমরা পাই সূর্য থেকে।

এই সূর্য কিরণের কিছুটা অবশ্য আমরা বহুকাল থেকে ব্যবহার করছি ফসল ফলাতে, ধান গম বা ফলমূল শুকোতে, মাছ শুকিয়ে শুঁট্‌কি তৈরি করতে, সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরি করতে, ভেজা কাপড়-চোপড় শুকোতে—এমনি আরো নানা কাজে। কিন্তু কয়লা, তেল বা গ্যাস আজ যে সব কাজে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ রান্না-বান্না করা, কল-কারখানা বা যানবাহন চালানো—তার জন্যে সৌরশক্তি ব্যবহারের উপায় কি ?

ইচ্ছে করলে আমরা সৌরশক্তি সরাসরি তাপের আকারে সংগ্রহ করতে পারি। এক বর্গ মিটার আকারের কালো রঙ করা পাত খাড়া সূর্য কিরণে রাখলে মোটামুটি এক হাজার ওয়াট বা এক কিলোওয়াট শক্তি সংগ্রহ করা যায়। এভাবে এক বর্গমিটার আকারের পাত্র থেকে সারা বছরে প্রায় দু'হাজার কিলোওয়াট-ঘণ্টা শক্তি সংগ্রহ করা সম্ভব। এই তাপের সাহায্যে শীতকালে ঘর গরম করা যায় ; জল গরম করা যায়। আবার এই শক্তির সাহায্যে গরমের দিনে ঘর ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থাও করা যায়। বাড়ির ছাতে এমনি সংগ্রাহক বসালে তারপর আর এই ব্যবস্থায় তেমন কিছু খরচ নেই।

সরাসরি তাপকে কেন্দ্রীভূত করে সৌরচুল্লিও তৈরি হয়েছে। গোলাকার বা অধিবৃত্ত আকারের প্রতিফলকে সূর্য কিরণ ঘনীভূত করে 300 ডিগ্রী পর্যন্ত উষ্ণতার সৃষ্টি হয় ; রান্নার জন্যে এমন শস্তা চুলো আজকাল কিনতে পাওয়া যায়। এমন একটি চুলো দিয়ে চার-পাঁচ জনের একটি পরিবারের সব ধরনের রান্নার কাজ চলতে পারে। এই চুলোর অসুবিধের দিক হল শুধু যখন আকাশে সূর্য থাকে তখনই এতে রান্না করা চলে।

এ ছাড়া বিজ্ঞানীরা সিলিকন প্রভৃতি বিশেষ উপাদান ব্যবহার করে এমন সৌরকোষ তৈরি করেছেন যাতে সৌর-শক্তি সরাসরি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ ধরনের সৌরকোষ প্রথম ব্যাপক আকারে ব্যবহার শুরু হয় নভোযানে। আজকাল ক্যালকুলেটর ঘড়ি এমনি অনেক ছোটখাট যন্ত্রপাতি চালাতে প্রচুর সৌরকোষ ব্যবহৃত হচ্ছে।

অনেক দেশে গ্রামাঞ্চলে বা দুর্গম জায়গায় যেখানে বিদ্যুৎ শক্তি নেই সেখানে এমনি সৌরকোষ বসিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। সৌরকোষের বিদ্যুৎ দিনের বেলা ব্যাটারিতে জমিয়ে রাখা হয় ; তারপর রাতেও তা থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা সৌরকোষের দাম কমাবার জন্যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

নতুন নতুন ধরনের শক্তির উৎস নিয়ে বিজ্ঞানীদের নানা গবেষণা চলছে। বিভিন্ন দেশে শক্তি ব্যবহারের নানা ধরনের সুবিধে রয়েছে। কোন দেশে হয়তো রয়েছে অনেক ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির সুবিধে, কোথাও আছে বায়ুপ্রবাহ বা সমুদ্রপ্রবাহের শক্তি ব্যবহারের সুবিধে ; কোন কোন দেশে মাটির তলা থেকে বেরিয়ে আসে ভূগর্ভস্থ তাপ। এ সব নতুন নতুন শক্তির উৎস কাজে লাগাবার জন্যে আজ বড় ধরনের চেষ্টা শুরু হয়েছে। এ সব গবেষণার ফলে আগামীতে নিশ্চয়ই আরো নানা ধরনের শক্তির ব্যবহার চালু হবে।

পূর্বাভাস, পূর্ববর্তী জ্ঞান আর ভবিষ্যদ্বাণী—এই তিন ভাবে জানা যায়, যা ঘটবে।

পূর্বাভাস ঘটে মোটামুটি জাগ্রত অবস্থায় অথবা স্বপ্নের রেশ হিসেবে। আবছা অনুভূতি। বন্ধুর এরোপ্লেন হয়তো ভেঙে পড়বে, অথবা অনেকদিন যার চিঠি পাইনি—তার চিঠি এসে পড়ে রয়েছে লেটার-বক্সে।

পূর্ববর্তী জ্ঞান আসে স্বপ্নের দৃশ্য থেকে অথবা কখনো দিবাস্বপ্নের মত অবস্থার মধ্যে থেকে। পূর্বাভাসের চাইতে আরও সুস্পষ্ট পূর্ববর্তী জ্ঞান। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ভবিষ্যতের ঘটনা যেন টের পাওয়া যায়। পরিবেশ বা দৈনন্দিন ব্যাপারের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই। বিরল দৃষ্টান্ত হিসেবে নরওয়ের ঘটনা বলা যেতে পারে। আওয়াজ শোনা যায় কিছু ঘটবার আগে। পদশব্দ শোনা যায় কেউ আসার আগে। দরজা খুলে যায় বা বন্ধ হয়ে যায় কেউ তা পেরিয়ে যাওয়ার আগে।

ভবিষ্যদ্বাণী উপরোক্ত দুটির চেয়ে ঢের বেশি ইচ্ছাকৃত। দুইভাবে ভবিষ্যতের কথা বলা যায়। এক, রাশিচক্র, হাতের রেখা, কাপে চায়ের পাতা ইত্যাদি অনেক রকমের চিহ্ন আর লক্ষণ বিচার করে। দুই, মন-পরিবর্তনের ওষুধ ব্যবহার, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম অতি-প্রাকৃত শক্তির সাহায্য গ্রহণ।

জাগতিক ভবিষ্যদ্বাণী যখন সত্যি হয়ে দাঁড়ায়, তখন দেখা যায় শেকলের আংটার মত সংযোগ রয়েছে অনেকগুলো বিষয়ে— স্মৃতি, পর্যবেক্ষণ, সঙ্কল্প, এবং ভাগ্য ঃ সব মিলিয়ে ব্যাপারটা তদন্তকারীর কাছে আরও রহস্যময় হয়ে দাঁড়ায়।

কতকগুলো প্রহেলিকাময় ঘটনা উপস্থাপিত করে দুর্জ্ঞেয় এই আলোচনা শুরু করা যাক।

ভবিষ্যদ্বক্তা চাষীর ছেলে

তার নাম রবার্ট নিক্সন। লোকে তাকে বলত মাথা-মোটা। আর পাঁচটা ছেলে থেকে আলাদা। মগজে জড়তা আছে।

জন্ম তার 1467 সালে—ইংল্যাণ্ডের একটা গ্রামে। ভয়ানক নির্বোধ বলে ক্ষেতখামারে ঘোড়া ধরা ছাড়া তার কপালে আর কাজ জোটেনি। বেশির ভাগ সময়ে বোবা হয়েই থাকত—মাঝে মাঝে কিন্তু বিড়বিড় করে আপন মনে কি যে বকে যেত কেউ মানে বুঝত না। মানে বুঝত না বলেই ধরে নিয়েছিল—মগজটাই অস্বাভাবিক। অর্থাৎ, পাগল।

একদিন ক্ষেতে লাঙল দিতে দিতে হঠাৎ গলার শির তুলে সে কি চিৎকার—লড়ছে ডিক! লড়ছে হ্যারি! লড়ছে, ডিক। একী করলে? সাবাস, হ্যারি, সাবাস! জিতে গেল হ্যারি!

হাবাগোবা রবার্ট নিক্সন এরকম আবোল তাবোল হামেশা বকে। কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু এবারের বকুনি অন্যান্য বারের চেয়ে সুস্পষ্ট। তাই ধাঁধায় পড়ল আশপাশের কাজের লোকেরা।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল পরের দিন। ঠিক যে মুহূর্তে রবার্ট অদ্ভুতভাবে চেঁচিয়েছে ঠিক সেই সময়ে বসওয়ার্থ ফিল্ডে নিহত হয়েছেন রাজা তৃতীয় রিচার্ড এবং যুদ্ধে জিতে ইংল্যাণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরী হয়েছেন হেনরী টিউডর।

আশ্চর্য এই দূরদর্শন শক্তির সংবাদ যথাসময়ে পৌঁছোলো নতুন রাজার কাছে। ভয়ানক অবাক হলেন তিনি এবং স্বচক্ষে দেখতে চাইলেন অলৌকিক শক্তিধর হাবাগোবা ছেলেটিকে।

রাজার দূত যখন লণ্ডন থেকে বেরিয়েছে রবার্ট নিক্সনকে খাতির করে রাজসভায় নিয়ে যাবে বলে—ঠিক তখন আবার ক্ষেপে গেল রবার্ট। ভীষণ ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল নানান জায়গায়। মুখে তার একটাই কথা—হেনরীর লোক আসছে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে না খাইয়ে মারবে বলে!

ইতিমধ্যে কিন্তু রাজা হেনরী রবার্ট নিক্সনকে যাচাই করার জন্যে জবড় ফন্দী এঁটেছিলেন। একটা দামী হীরে লুকিয়ে রেখেছিলেন। রটনা করেছিলেন—হীরে খোয়া গেছে। কোথায় আছে, বলতে পারবে কি রবার্ট?

রাজার সামনে এসে কিন্তু দারুণ বিচলিত হয়ে পড়েছিল রবার্ট। হীরে কোথায়? কোথায় আবার—যে রক্ষক সেই

The New York Times.

TITANIC SINKS FOUR HOURS AFTER HITTING ICEBERG; 866 RESCUED BY CARPATHIA, PROBABLY 1250 PERISH; ISMAY SAFE, MRS. ASTOR MAYBE, NOTED NAMES MISSING

1912, 16 এপ্রিল নিউইয়র্ক টাইমস-এ বেরোয়—টাইটানিক ডুবে গেছে। ভবিষ্যতে মিলেও গিয়েছিল—এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের সংবাদ।

যদি ভক্ষক হয়, হীরে পাওয়া যাবে রক্ষক স্বয়ং উদ্যোগী হলে !

চমৎকৃত হলেন রাজা হেনরী। হুকুম দিলেন, রবার্ট যা-যা বলবে, সব যেন লিখে রাখা হয়।

তাই হয়েছিল। হেঁয়ালির ভাষায় রবার্ট যা বলেছিল, তার ব্যাখ্যাও করা হয়েছিল। তার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পরে মিলে গেছিল। ইংল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল রাজারা নিহত এবং গায়েব হয়েছিলেন, ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধও লেগেছিল।

শুধু একটা ব্যাপার আজও ঘটেনি। নাণ্টউইচ শহরটা এখনও জলপ্লাবিত হয় নি।

ভবিষ্যতের অনেক কথাই বলে গেছিল হাবাগোবা রবার্ট—সবচেয়ে চমকপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণীটা ছিল নিজের অন্তিমদশা সম্পর্কে। রাজপ্রাসাদেই নাকি স্রেফ না খাইয়ে মেরে ফেলা হবে তাকে।

ভয়ে কাঠ ছেলেটাকে আশ্বস্ত করার জন্যে রাজা হেনরী হুকুম দিয়েছিলেন—রবার্ট যখন যা খেতে চাইবে, তক্ষুনি যেন তাকে তা দেওয়া হয়। রাজার রান্নাঘরে তার যাতায়াত কেউ যেন না আটকায়।

রাজার হুকুম ! অক্ষরে অক্ষরে তা মেনে চলা হয়েছিল—কিন্তু মনে মনে রবার্টের ওপর রেগে আগুন হয়েছিল রান্নাঘরের লোকজনেরা। হাবাগোবা চাষার ঘরের একটা ছেলেকে এত জামাই আদর করলে পাঁচজনের চোখ তো টাটাবেই।

তারপর এল সেই ভয়ঙ্কর দিনটা। লণ্ডনের বাইরে গেলেন রাজামশায়। বিশ্বস্ত একজন অফিসারকে বলে গেলেন—রবার্টের আদর আপ্যায়নে যেন কোন ত্রুটি না হয়।

প্রাসাদের লোকজনেরা রবার্টকে দুচক্ষে দেখতে পারে না—এ খবর রাখতেন বিশ্বস্ত এই অফিসারটি। তাই তাকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখবার জন্যে রেখে দিলেন রাজারই খাস-কামরায়, চাবি দিয়ে রাখলেন দরজায়।

আর ঠিক তার পরেই জরুরী তলব আসায় লণ্ডনের বাইরে গেলেন অফিসার—তাড়াহুড়োয় চাবি রেখে যেতে ভুলে গেলেন, এমনকি রবার্টকে দেখাশুনা করার জন্যে নির্দেশ দিয়ে যেতে বিস্মৃত হলেন।

ফলটা হল মারাত্মক। কাজ শেষ করে লণ্ডনে ফিরে এসে অফিসারটি দেখলেন—না খেয়ে মারা গেছে রবার্ট।

হিটলারের আবির্ভাবের অনেক আগে

মাইকেল নোসত্রাদামুস অতি বিখ্যাত ভবিষ্যৎ-বক্তা। এঁর জন্ম ফ্রান্সে—1503 সালে। বই আকারে নিজের ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেছিলেন মোট দশটি খণ্ডে প্রায় এক হাজার ভবিষ্যদ্বাণী। নাম দিয়েছিলেন—CENTURIES ফ্রান্সেই ইনি মারা যান 1566 সালে।

ভবিষ্যতের কথা ইনি ছড়ায় লিখে যেতেন। প্রতীক ব্যবহার করতেন ছড়ার মধ্যে। মানে বুঝে নিতে হত। ছড়ায় যে সব ঘটনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সেগুলো পরে ঘটেছিল।

রাজা দ্বিতীয় হেনরীকে ইনি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, 1792 সালটা রাজত্ব সম্পর্কে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বছর হবে। ঐ বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে ফরাসী বিপ্লব চরমে পৌঁছোয় এবং ফ্রান্সে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে শোচনীয়ভাবে। কুইন মেরী অ্যানতোনিয়েত-কে গিলোটিনে প্রাণ দিতে হল জনগণের ইচ্ছায়—জনগণের ইচ্ছায় যখন এ রকম কাণ্ড ঘটতো না, তখনই কিন্তু এই পদ্ধতিতে রানীর মৃত্যুর ভবিষ্যৎবাণী করে গেছিলেন নোস-ত্রাদামুস তাঁর বিচিত্র ছড়ার মধ্যে।

নেপোলিয়ন যে ফরাসী সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েও বন্দীদশায় শেষ জীবন কাটাবেন ছোট্ট দ্বীপ সেন্ট হেলেনায় 1815 সালে—এ কথাও লিখে গেছিলেন আশ্চর্য এই ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। বলে গেছিলেন, 1936-এ গায়েব হবেন গ্রেট-বৃটেনের রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড এবং তাই হয়েছিল।

হিটলারের নামটা প্রায় নিখুঁতভাবেই লিখেছিলেন নোসত্রাদামুস। 'হিটলার' না লিখে, লিখেছিলেন 'হিসটার'। ইউরোপে আতঙ্ক জাগাবেন তিনি কি ভাবে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

এইভাবেই ভবিষ্যতের ইতিহাস লিখে গেছিলেন আশ্চর্যএই মানুষটি।

[শেষাংশ 47 পৃষ্ঠায়]

খুদে বৈজ্ঞানিক
দিলীপ দাস
মেজকা—মাইক্রোসকোপ! কোথেকে হাতালে মেজকা?
ইডিয়েট! কেন হাতানো ছাড়া কি কিনতে পাওয়া যায় না? দস্তুর মতো নগদ টাকায় কেনা।
ইস, একটা বাইনোকিউলার কিনলে পারতে, কত দূরের জিনিস পরিষ্কার দেখতে পেতে।
আরে মুর্খ! কাছেই কত জিনিস আছে আগে তাই দ্যাখ—ভয়ঙ্কর সব জীবানু! তাদের দেখতে হলে দরকার এই যন্ত্র।
অদ্ভুত! আমিও একটু দেখবো মেজকা!
নিশ্চয়ই দেখবি। আমার কাছে আয়।
ওব্বাবা, তুমি আবার ইনজেকশানের সিরিঞ্জও কিনেছ!
তুই কি ভেবেছিস এটাও ঝাড়া?
দাঁড়া, ঠিক করে।
আরে! একি করছো! আমাকে হঠাৎ ইনজেকশান্ কেন?
আঃ, নড়িসনি তো!

আ-আমি তো কয়েক দিন আগেই টি.এ.বি.সি নিয়েছি!
থামেথ্যা চেল্লাসনি আমি কি তোকে ইনজেকশান্ দিচ্ছি না কি?
তোর দেহ থেকে আমি এক ফোঁটা রক্ত নেবো। সেই রক্ত এই যন্ত্র দিয়ে দেখলে দেখতে পাবি এক বিরাট রহস্য এতে লুকিয়ে আছে! দেখবি এই মাইক্রোসকোপের কি ক্ষমতা।
রক্ত! ওরে বাবারে, রক্ত নিলে আমি মরে যাবো!
রক্ত নিলে কে কবে মরেছে, রাসকেল! লোকেরা এমনিই কত রক্ত দান করে। মরলে কি তারা রক্ত দিত?
মেজকা, ঐ ডগা-র রক্ত দিয়ে কাজ হবে না?
ওরে বাবা! আমি ওসব রক্তা রক্তির মধ্যে নেই!
আ-মোলো যা! কুকুর আর মানুষের রক্ত কি এক হল? ব্যথা তো দূরের কথা, বুঝতেই পারবি না—
আর এর জন্য তোকে একটা ভাল গপ্পের বই প্রেজেন্ট্ করবো।
শুধু বই দিলে হবে না, দু'টাকার ফুচ্কাও খাওয়াতে হবে।
অলরাইট্! নে—ঘুরে দাঁড়া, একদম নড়বি না।
মেজ্কা!
আবার কি হল?
আমি যদি নিজের রক্ত নিজে বের করে দিই, তাহলে হবে না?
কেন হবে না! রক্ত হলেই হলো। আমার কোনো আপত্তি নেই।

আচ্ছা, মেজকা, তুমিও তো নিজের খানিকটা রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করতে পারো।
দ্যাখ খুদে, আমার ব্লাড, স্টুল, ইউরিন স্পুটাম্ স-ব পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন তুই আমার দুই নম্বর ক্যান্ডিডেট্!
তাহলে ব্যাহি পেচ্ছাব গু মুতও পরীক্ষা হয়?
কেন হবে না! জার্ম তো ওতেও থাকে।
তাহলে তুমি আমার গু মুত দিয়েই শুরু করো। যতটা চাও ততটাই দিতে পারবো।
খু-উ-দে-!
এইমাত্র তুই রক্ত দিবি বলে এখন কথা ঘোরাচ্ছিস্!
আ-আচ্ছা, দি-দিচ্ছি!
এতই যদি ওর রক্ত পরীক্ষার শখ, তো ব্লাড-ব্যাঙ্ক থেকে একটু রক্ত কিনে এনে নিলেই পারে।
কি হলো, চুপ মেরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?
তুমি এখানে থাকলে হবে না। আমি একা একা বের করবো।
ঠিক আছে, আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি। হয়ে গেলে ডাকবি, দেরী করবি না।

এর পর জানতে হলে, আগামী সংখ্যায় দেখ ০

পরিবেশ দূষণ এবং বিজ্ঞান ক্লাবগুলির ভূমিকা

পার্থ মুখোপাধ্যায়

এ কথাটা আজ প্রায় কারোর অজানা নেই যে '5ই জুন' কে রাষ্ট্রসংঘ 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসাবে সূচিত করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' কতখানি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন তা অচিরেই বিতর্কের বিষয় হতে পারে। প্রতি বছর যখন জুন মাসে প্রথম সপ্তাহে পরিবেশ দিবস নিয়ে আলোচনাচক্র পর্যালোচনা, অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, বিশেষজ্ঞরা দেন জ্ঞানগর্ভ ভাষণ, প্রশাসকরা দেন জটিল সব তথ্যসমূহ, ভবিষ্যতের জন্য নেওয়া হয় কর্মসূচী, চলে পর্যালোচনা, কিন্তু সচেতনতা বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের মনে কোন রেখাপাত করে বলে মনে হয় না। কেননা তাহলে এই গণহারে বৃক্ষচ্ছেদন, কীটনাশক ব্যবহার, যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ, কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ পরিত্যাগের সর্বোত্তম স্থান মা গঙ্গার জল, এগুলো হত না। অথচ যাঁদের দ্বারা এইসব ক্রিয়াকলাপ সাধিত হচ্ছে তাদের মাথায় এই সহজ সত্যটা ঢোকা উচিত ছিল যে, পরিবেশকে তারা যে হারে বিষাক্ত করে তুলেছেন তার বিষময় ফল ভোগ করতে হবে তাঁকেই বা তাঁর পরবর্তী প্রজন্মকে, কিন্তু এই জনসংযোগটা সরকারী তরফ যেমন করছেন তেমনি ছাত্রসমাজ ও প্রকৃত শিক্ষিতরা ভাল করতে পারেন। তবে হ্যাঁ, ছাত্ররা কিছু কাজ করছে, তাই এই প্রতিবেদনের অবতারণা।

কি রকম ভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে

আমরা চাষের প্রয়োজনে বিভিন্ন কীটনাশক ওষুধ, ব্যবহার করি। দেখা গেছে এইসব কীটনাশকের বিষাক্ত পদার্থ শস্য, শাকসব্জি বা চাষের জমি সংলগ্ন খালবিলে স্থিত মাছেদের শরীরের কোষে জমা হচ্ছে নিয়মিতভাবে। ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন, এই সমস্ত কীটনাশকের মূল উপাদান। পরীক্ষায় দেখা গেছে বাজারের শাকসব্জির কোষে সঞ্চিত আছে বহু কীটনাশক ওষুধ। আবার এও দেখা গেছে কোন কোন মাছের দেহে 210 পার্টস্ পার মি. ক্লোরিনেটেও হাইড্রোকার্বন আছে, কিন্তু তাতে মাছেদের কোন ক্ষতি হচ্ছে না, স্বাভাবিকভাবেই জীবনধারণ করতে সক্ষম বা বংশ বিস্তারেও কোন প্রতিবন্ধক হয় না। কিন্তু ওই মাছ যখন আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি তখন দেখা যায় বিপর্যয়। শস্যর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। আবার, শস্যে প্রযুক্ত কীটনাশক জলবায়ু গাছপালা-মাটি-শস্য-এর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে, আর, এই সমস্ত কীটনাশক প্রয়োগকারী ফসল থেকে বিষাক্ত পদার্থ অপসারণ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, আর তা সহজে বোঝাও যায় না, ফলে অচিরেই তা বিষমুক্ত টাটকা বিশেষণে ভূষিত হয়ে বাজারে আসছে, ক্ষতিগ্রস্ত আমরা যাঁরা তা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি, কোন কোন ক্ষেত্রে আলসার বা ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে।

আবার আজকের ভূমণ্ডল অর্থাৎ জল-বায়ু-মাটি ভীষণ ভাবে দূষিত। ব্যাপারটা কী ? আজকের ভারতবর্ষে প্রায় সমস্ত কল-কারখানা গড়ে উঠছে দেশের নদীগুলোর ধারে ধারে। একথা সত্য যে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়োজনে শিল্পের বিকাশের অবশ্য প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা বলে রাতের বেলায় বা যে কোন উপায়ে কারখানার বর্জ্য পদার্থ ফেলা হচ্ছে নদীতে। হ্যাঁ সরকারী বহু বিধিনিষেধ আছে, আছে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। কিন্তু এইসব স্বার্থান্বেষীরা নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য যেন তেন প্রকারেন কারখানার জটিল-দূষিত পদার্থ ঢেলে দিচ্ছে গঙ্গার বুকে, পতিতোধারণী গঙ্গে ! দেখা গেছে এইসব জটিল পদার্থের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ডিটারজেন্ট, ধাতু মিশ্রিত স্ল্যাব, পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ ও বহু জৈব উপাদান। এই সমস্ত যাচ্ছে নদীর মাধ্যমে মোহনা, সমুদ্রে। ক্ষতিগ্রস্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে বহু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী। অক্সিজেনের অভাবে মারা পড়ছে বহু জলজ প্রাণী। এই তো কিছুদিনের ঘটনা টিটাগড় থার্মাল প্ল্যান্টের গরম জলে ওই অঞ্চলের গরম জলের উষ্ণতা প্রায় 4°C বাড়িয়ে দিয়েছিল, জলজ উদ্ভিদ বা প্রাণীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, মরা মাছ ভেসে উঠেছিল, প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ডঃ তারকমোহন দাসের প্রচেষ্টায় আজ তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

বায়ু দূষণ নিয়ে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই মনে আসে কলকাতার কথা। কলকাতার মানুষেরা যে বাতাস নেন দেখা গেছে তার মধ্যে সাসপেণ্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার, সালফার ডাই অক্সাইড, অক্সাইড অফ্ নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড গ্রহণ করছেন। সমীক্ষায় প্রকাশ বিশ্বে আর কোথাও নাকি জল হাওয়ার মধ্যে এই সব

বস্তু পাওয়া যায় না, আর এখানেই শেষ নয়, কলকাতার হাওয়াতে আছে অ্যারোমেটিক পলিনিউক্লিয়ার হাইড্রোকার্বন, সীসে, নিকেল বা অ্যাসবেসটস গুঁড়ো। অথচ 1970 থেকে কলকাতা (ভারতের একমাত্র শহর) যে ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল এঞ্জিনিয়ারিং ইনৃস্টিটিউট (NEERI) এর সমীক্ষার জন্য মনোনীত হয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ বা সচেতনতা বা কলকাতাকে দূষিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে তাঁরা পারেন নি। আজ কলকাতার বাতাসে 6·63 microgram/cubiemt ; ওদিকে জার্মানির বার্লিনেও যখন খুব খারাপ অবস্থা তখন পরিমাণটা ছিল 1·40 microgram/cubiemt, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সীসে কিরকম মারাত্মক বিষ। কিন্তু তবুও আমরা তা গ্রহণ করছি যেহেতু হাওয়াকে ফুসফুসে চালান না করলে চলবে না, আর নাকের ডগায় বা ঠোঁটেতে আমাদের ফিল্টার লাগান নেই। এ থেকে পেটের নানা অসুখ, পেট মোচড়ানো, কোষ্ঠ কাঠিন্য খিদে বা ঘুম কমে যাওয়া, খিটখিটে মেজাজ হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে কিডনি ড্যামেজ, কোন কোন ক্ষেত্রে শিশু মানসিক জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হতে পারে।

জল দূষণের ফল আজ প্রধান সমস্যা হয়েছে। আমাদের চোখে গঙ্গা দেবী, ফলে যত পাপীদের আশ্রয় তার পায়েই, ফলশ্রুতি বেনারস বা কাশীতে শ্মশানের আগুন নেবে না। সমীক্ষায় দেখা গেছে বছরে প্রায় 2500 দেহ আধপোড়া অবস্থায় গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হয়, শুধু গঙ্গায়, এর মধ্যে ন্যূনতম পক্ষে 500টি দেহ পচে গলে মেশে গঙ্গার জলে। পবিত্র মা গঙ্গার ধারে অবস্থিত 8,61,404 বর্গ কিমি এলাকার যাবতীয় শিল্পের নোংরার সঙ্গে শহরের আবর্জনা, কৃষির কাজে ব্যবহৃত সার, কীটনাশক, জলদূষণের ঠাঁই এই গঙ্গা। গঙ্গার ধারে অবস্থিত 692টি শহরের মধ্যে অন্ততঃ 200টির যাবতীয় ময়লার অন্তিম স্থান মা গঙ্গার বক্ষ। এখানেই শেষ নয়। গঙ্গার ধারের 25টি বড় শহরের 100 কোটি লিটার ময়লা জল গঙ্গায় মিশছে। না, এর পরেও গঙ্গা শুদ্ধ থাকবে এ আশা বোধ হয় পাগলেও করবে না।

এ ছাড়াও আছে গণহারে বৃক্ষচ্ছেদন। ভারতের জাতীয় বন নীতিতে বলা আছে (1952), দেশের এক তৃতীয়াংশ বনাঞ্চল থাকতে হবে। কিছু দিন আগে সরকার (কেন্দ্রীয়) দাবী করলেন দেশের 23 শতাংশ জমিতে বন আছে, পাশাপাশি উপগ্রহ জানাচ্ছে মাত্র 11 শতাংশ জমিতে বন আছে, তাতেও হুঁশ নেই, ঠাণ্ডা ঘরে বসে কোন প্ল্যান করা যত সহজ, বাস্তবে তার ইমপ্লিমেনটেশন যে কত কঠিন বিজ্ঞান সংগঠনগুলি ছাড়া সরকারী আমলারা তা বোঝেন না।

আমরা কি করতে পারি :

অনেক কিছুই পারি। যেমন ধরুন এত বেশি হারে কীটনাশকের ব্যবহারের পরিবর্তে জৈব নিয়ন্ত্রণ চালু করতে পারি, তার পক্ষে প্রচার চালাতে পারি। জৈব নিয়ন্ত্রণ জিনিসটা কি? জীবাণু বিজ্ঞানী Dr. A. Kerr বলেছেন "any method of control that involves biological rather than physical or chemical methods" কিন্তু আজ্ঞার ব্যাপ্তি অনেক তাই কেউ কেউ বলেন, "it is the use of one Specific organism to control another specific organism." একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। বহরমপুর ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণকেন্দ্রের *বিজ্ঞানীরা (প্রজনন বিজ্ঞানী) সরিষা তৈলবীজের ক্ষেতে* এক ধরনের জাত উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন যার কাণ্ড মসৃণ ও চকচকে এবং ফুলের রঙ সাদা। হলুদ ফুল বা রঙের কাঙাল Aphis সাদা ফুলের সরিষা ঘৃণা ভরে ত্যাগ করে। বিশেষতঃ কাণ্ড মসৃণ হওয়াতে ওখানে আরামে বসতে পারে না। তাই ঐ ধরনের জাত Aphis এর হাত থেকে বেঁচে যায়। আবার ঐ কেন্দ্রের প্যাথলজি বিভাগের বিজ্ঞানীরা জৈব নিয়ন্ত্রণের নিরিখে বিগত কয়েকবছর ধরে লক্ষ্য করেছেন ছোলার ঢলে পড়া রোগ (wilit) কমে যায় যদি ছোলার সাথে তিসি মিশ্র ফসল হিসাবে চাষ করা যায়। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে ছোলার ঢলে পড়া রোগ একটা বিরাট সমস্যা। অনেক সময় এর জন্য দায়ী ছত্রাকদের রাসায়নিক ওষুধ (fungicise) দিয়েও রোধ করা যায় না, স্বাভাবিকভাবেই উপরোক্ত ফল থেকে আমরা উৎসাহিত বোধ করতে পারি এবং জৈব নিয়ন্ত্রণ চালু করলে একধারে যেমন পরিবেশ দূষণ রোধ করা যাবে তেমনি অর্থকরী আশ্রয়ও বটে। সমস্ত কাজে তা পরিবেশ দূষণই বলুন বা বৃক্ষচ্ছেদন রোধ ও বৃক্ষরোপণই বলুন বা যাই বলুন না কেন দূষণ সমন্ধে তাতে সরকারীস্তরে সচেতনতা ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে (সবচেয়ে বড় প্রমাণ ভূপাল) কিন্তু পাশাপাশি এও ঠিক নাগরিকদের ভিতরেই বা কতটা পরিবেশ সচেতন গড়ে উঠেছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

বিজ্ঞান ক্লাবগুলো কি করছে

হ্যাঁ, নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা ও জনসংযোগের কাজটা বিজ্ঞান ক্লাবগুলো ভাল করতে পারে। বা এইভাবে বলা যায়, যেখানে সরকারী মাধ্যমের সীমাবদ্ধতা সেখানেই বিজ্ঞান ক্লাবগুলির স্বাভাবিক বিচরণ ক্ষেত্র, কিন্তু সেভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি, বিজ্ঞান ক্লাবগুলি। তাদের অনেকেই আজও মাঝে মাঝে তথ্যনির্ভর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ, সেমিনার আর মডেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যতিক্রমও আছে। যেমন মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি বিখ্যাত জিলা বিজ্ঞান পরিষদ, জেলার কাতলামারী রানী-

নগর অঞ্চলে আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায়, তাঁরা প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ পরিতোষ ভট্টাচার্যকে ঐ অঞ্চলে নিয়ে যান এবং অন্-দি-স্পট জলের নমুনা সংগ্রহ করে কোন জলে আর্সেনিক আছে, কোথায় নেই তা বলে দেন এবং জনসাধারণের বিভিন্ন রকমের প্রশ্নোত্তরের উত্তর দেন, আর্সেনিক রোগাক্রান্তদের সনাক্ত করে হসপিটালে ভর্তির ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজ করেন। নিঃসন্দেহে ভাল কাজ। এরকম আঞ্চলিক সমস্যাকে সমাধান করতে পারেন বিজ্ঞান ক্লাবগুলিই।

এ বছরের গোড়ায় ভারত সরকার সমগ্র ভারতের বিয়াল্লিশ জন ছেলেমেয়েকে নিয়ে একটি সেমিনার ও সার্ভে করান। এই সমস্ত ছেলেমেয়ে বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনের সাথে যুক্ত। এই প্রতিবেদকের সৌভাগ্য পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে সেই সেমিনারে উপস্থিত থাকতে পেরেছিল। তাতে সার্ভেতে দেখা যায় পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে আন্দোলন কোন সন্দেহ নেই পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে চিন্তাভাবনা দারুণভাবে শুরু হয়েছে, কিন্তু সেটাকে বাস্তবায়িত করা শুরু হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এই বিষয়ে উল্লেখ্যযোগ্যভাবে এগিয়ে আছে কেরল, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ।" এটা দেখা যাচ্ছে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা ত্রিশোর্ধ বয়স্কদের মধ্যে ততটা দেখা যায় না, এই জনসংযোগের কাজটা ভালভাবে করতে পারলে পরিবেশ দুষণ-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও জোরদার হবে আর জনসংযোগের সবচেয়ে ভাল মাধ্যম হিসাবে বিজ্ঞান ক্লাবগুলির বিকল্প নেই। ভারত জন বিজ্ঞান জাঠার পূর্বাঞ্চলীয় পথ পরিক্রমার সময় যত লোককে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা গেছে তাতে অন্ততঃ একথা সুস্পষ্ট সচেতনতা গ্রামাঞ্চলেও লক্ষিত হচ্ছে, কেননা মুর্শিদাবাদ জেলার গোকর্ণ নামক প্রায় অখ্যাত কৃষি প্রধান গ্রামে যখন পাঁচ-ছয় হাজার লোক জোর করে জাঠাকে মাঝপথে থামিয়ে অনুষ্ঠান করার কথা বলে এবং শুধু হুজুগে পড়ে অনুষ্ঠান দেখার জন্যই যে তারা এমন করেছিল তাই নয়। তাদের বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন শুনে জাঠায় অংগ্রহণকারী ও অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ সচেতনতা আসছে, সেটা মূল থেকেই আসছে, আর আশার কথা বিজ্ঞান ক্লাবগুলির ভূমিকা যথেষ্ট ইতিবাচক ও আশাব্যাপক। তাই সেই আশাতেই, আরো ভাল কাজ আরো জনসংযোগ তবেই এই লেখার সার্থকতা

ডালশস্য তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র। ফ্ল্যাট নং—দক্ষিণী 15। বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, 7-2101

মজার অঙ্ক

জয়ন্ত ঘোষ দস্তিদার

আজ একটা মজার অঙ্ক নিয়ে লিখছি যেটা দেখিয়ে তোমরা তোমাদের বন্ধুবান্ধবদের চমকে দিতে পারবে।

যেমন ধরো; তোমাদের কেউ তার এক বন্ধুকে গম্ভীর মুখে বললে—প্রমাণ কর, $11 = 703$ বা $571 = 907$ ইত্যাদি। বন্ধুতো তোমার এরকম হেঁয়ালী কথা শুনে বিষম খাবে। অবশ্য তা জানা থাকলে সে এটা সহজেই প্রমাণ করতে পারবে। কিন্তু তার আগে এ পদ্ধতিটা তো তোমারই জানা আবশ্যক তাই না ? তাই বন্ধুর অগোচরে তোমাকে এর প্রমাণটা শিখিয়ে দিচ্ছি।

আমরা জানি,

$$11^\circ = 1$$

কারণ, $$11^\circ = 11^{m-m}$$

বা, $$\frac{11m}{11m} = 1$$

অনরূপে প্রমাণ করা যায়, $703^\circ = 1$

এখন দুইটি রাশির পাওয়ার সমান (এক্ষেত্রে 0) এবং তাদের সার্বিক মান পরস্পর সমান হলে লেখা যায়,

$$11^\circ = 703^\circ$$

অর্থাৎ $11 = 703$

কারণ উভয়দিকের পাওয়ার সমান ও উভয়ের সার্বিক মান সমান ; সুতরাং উহাদের Base ও সমান। এইভাবে দ্বিতীয় প্রমাণটা ও তুমি নিজেই করতে পার। তুমি নিজেও যে কোন দুইটি সংখ্যা নিয়ে তাদের পরস্পর উপরিউক্ত প্রণালীতে সমান বলে প্রমাণ করতে পারবে।

কী, অঙ্কটা সত্যিই মজার তাই না ?

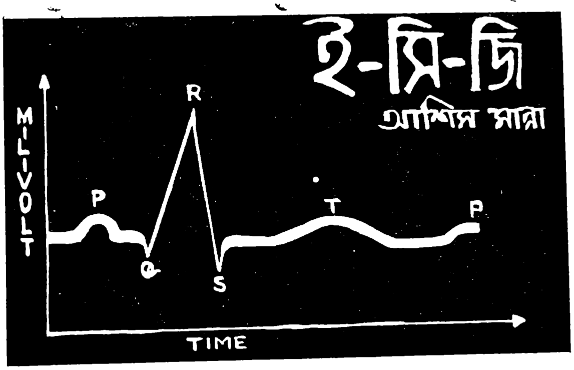

ই-সি-জি

আশিস সাহা

ই-সি-জি কি ?

ইলেক্‌ট্রোকার্ডিওগ্রাম বা সংক্ষেপে ই সি জি (E C G) কথাটি বর্তমানে খুব প্রচলিত। ডাক্তারবাবুরা তো সামান্যতম হৃদরোগের আশংকা করলেই ই সি জি করবার নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে রোগীরও আতংক—অনেকেরই দেখেছি একটা ভুল ধারণা আছে যে রোগীর হৃদযন্ত্রে ইলেক্‌ট্রিক শক দিয়ে যে গ্রাফ পাওয়া যায়, তা-ই হচ্ছে ই সি জি। বলা বাহুল্য, ব্যাপারটা মোটেই তা নয়।

ই সি জি ব্যাখ্যা করতে গেলে হৃদস্পন্দন সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে হয়। হৃদ্‌পিণ্ড সংকুচিত হয় একটি বিশেষ মাধ্যমের সাহায্যে ; এর চারটি অংশ—সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (SAN), অ্যাট্রিও-ভেণ্টি্‌কুলার নোড (AVN), বাণ্ড্‌ল অব্‌ হিজ (B) ও পারকিনজি ফাইবার (P), SAN হৃদস্পন্দনের উদ্দীপনা সৃষ্টি (Ramp generation) করে, AVN তা গ্রহণ করে, B তা বহন করে নিয়ে ডান ও বাম শাখার মাধ্যমে হৃদ্‌পিণ্ডের দুদিকের নিলয়ে P কে দেয়। P-র সাহায্যে ছড়িয়ে পড়ে হৃদপেশীর সঙ্কোচন ঘটায় এই উদ্দীপনা, যার ক্রমাগত ও অবিরাম সৃষ্টি SAN থেকে। সে কারণেই S A N-কে বলা হয় হৃদযন্ত্রের 'পেসমেকার'।

এই উদ্দীপনা পুরোপুরিই বৈদ্যুতিক ; তবে অত্যল্প মাত্রায় বলে একে বলা হয় অণু বৈদ্যুতিক (Micro-electric), হৃদপিণ্ডের এই বিভিন্ন অণু বৈদ্যুতিক কার্য-কলাপ সুবিধামত গ্রহণ ও বিবর্ধিত করে তাকে 'গ্রাফ' বা লেখ-র আকারে প্রকাশ করলেই ই সি জি পাওয়া যায়।

কবে ? 1887তে ওয়ালার প্রথম ই সি জি রেকর্ড করেন। কিন্তু এর বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা ও সঠিকতম পাঠ নেন আইনথোভ্‌ন (Einthoven : 1903), তাই তাঁকেই Father of Electrocardiography বলা হয়। বহুল ব্যবহৃত Direct Pen Recorder Device-টি অবশ্য পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত।

কিভাবে ? ই সি জি করতে হলে রোগীকে শুইয়ে তার দুই হাতে ও দুই পায়ে চারটি ধাতব পাত ছুঁইয়ে রাখা হয়, ঘড়ির মত ব্যাণ্ডের সাহায্যে। (ভালভাবে অণুবিদ্যুত গ্রহণ করবার জন্য ইলেক্‌ট্রোলাইট জেলী লাগানো হয় ত্বকে। এই ধাতব পাতগুলিকে বলে লীড (Lead)। আর একটি ড্রপারের মত লীড (Exploring) বুকের উপর বিভিন্ন জায়গায় লাগিয়ে রাখা যায়। অনেক সময় গ্রাসনালীর ভেতরেও লীড ঢুকিয়ে ই সি জি নেওয়া হয়।

লীডগুলিকে তার দিয়ে সঠিকভাবে যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে যন্ত্র চালু করলেই বিশেষ ধরনের কাগজে ই সি জি আঁকা হয়ে যায়। কাগজটি মি. মি. হিসাবে ঘর কাটা এবং প্রতি মিনিটে কাগজ 25 মি. মি. এগোয়। ফলে উদ্দীপনা প্রবাহের লময় কাগজে দূরত্ব দেখেই নির্ণয় করা যায়।

কেন ? ই সি জি দেখেই ডাক্তারবাবুরা বোঝেন রোগীর হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থা কেমন। বিভিন্ন ধরনের হার্ট ব্লক, করোনারী থ্রম্বোসিস, হাইপারট্রফি—অর্থাৎ অধিক কার্য-শীলতা, হৃদপেশীর অস্বাভাবিকতা ইণ্টার অ্যাট্রিয়াল বা ইণ্টার ভেণ্টি্‌কুলার সেপ্টামে ছিদ্র (ASD বা VSD)— সমস্তই ধরা যায় ঐ আঁকিবুকি থেকে। শুধু কি তাই ? রোগ কতটা সারল (Prognosis) জানতে, বা কোন ওষুধ হৃদপিণ্ডের ওপর কি প্রভাব ফেলে তা নির্ণয় করতেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

কিরকম ? একটু নিজে নিজেই দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে ? একটা সাধারণ ই সি জি হাতে নিন। তাকান যেখানে II লেখা আছে, দেখুন একটা লম্বা রেখা অনেকটা উঠেই নেমে এসেছে। ঐ-টি R ঢেউ (Wave), R যেখানে শুরু, সেটি Q : যেখানে শেষ, সেটি S। এবার R-এর আগে পরে দুটি ছোট ছোট ঢিপি—P ও T। দেখুন T-এর পর আবার P ঘুরে আসছে। P, R, T উঠছে ওপরে, তাই ওগুলি পজিটিভ : পক্ষান্তরে Q ও S নীচে নামে, তাই ওরা নেগেটিভ ওয়েভ।

ই সি জি থেকে হার্ট রেট গুণবেন ? একটা R এর মাথা থেকে পরের R-এর মাথা পর্যন্ত কটা ছোট ঘর হয় গুণে, তা দিয়ে 1500 কে ভাগ দিয়ে দিন—পেয়ে যাবেন।

এবার হৃদ্‌যন্ত্রে কোন গোলমালের আভাস পেলেই ই সি জি করান। জানবেন, ই সি জি থেকে যা জানা যায়, বুক কেটে হৃদপিণ্ড বের করে দেখেও অতখানি জানা যায় না।

স্যার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ, স্টুডেন্টস্‌ হোস্টেল, কলকাতা-700014

ধারাবাহিক উপন্যাস

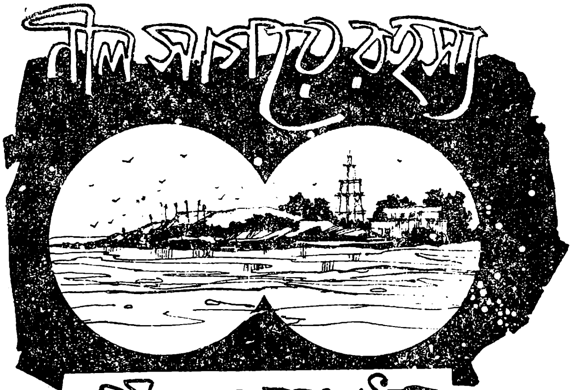

নীল সাগরের রহস্য

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[ছয়]

একদিন বাদ দিয়ে অর্থাৎ পরশু জাহাজ ছাড়বার কথা ভোরে সাড়ে পাঁচটায়। তাই ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে ঘুম থেকে উঠেছি ভোর চারটে নাগাদ। বিছানাপত্র বেঁধে অপেক্ষা করছিলাম। কখন শংকরকাকার জিপ আসে।

শংকরকাকার জিপ ঠিক সময়মতোই পৌঁছে গেল আমাদের বাংলোয়। জিপে মালপত্র তোলবার আগে আমার শান্তিনিকেতনী ঝোলাটা খুলে একবার দেখে নিলাম চকলেট বোমা আর দোদমাগুলো ঠিক আছে কিনা।

জাহাজঘাটায় পৌঁছে দেখি, শংকরকাকাও এসে গেছেন। ভেবেছিলাম, জাহাজ মানেই এম ভি আন্দামানের মতো বড় জাহাজ। কিন্তু ও হরি, এ যে দেখছি নামেই জাহাজ, আসলে মোটর বোটের চেয়ে সামান্য বড়। ছোট হলে কি হবে, এই ঝকঝকে সুন্দর জাহাজটা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। বকের মতো সাদা রং। মনে হয় যেন সমুদ্রের নীল জলে একটা বড় সাদা রাজহাঁস সাঁতার কাটছে। জাহাজটায় দুটো কেবিন। বড় কেবিনটায় থাকব আমি, সৃজনকাকা আর শংকরকাকা। আর ছোট কেবিনে জাহাজের ক্যাপ্টেন মানে সারেং ও তাঁর সহকারী। তাছাড়া সঙ্গে একজন রাঁধুনি। রাধুনি হলেও জাহাজের কাজকর্ম অনেকটাই জানে।

জাহাজটার নাম বেশ অদ্ভুত—'জারোয়া'। এখনকার একদল জঙ্গলবাসী উপজাতির নামে নাম। শংকরকাকার কাছ থেকে শুনেছিলাম, এরা নাকি দক্ষিণ ও মধ্য আন্দামানের পশ্চিমদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ী অঞ্চলে থাকে। সভ্যতার কোন ধার ধারে না। এইসব কৃষ্ণকায় জারোয়ার দল। মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই উলঙ্গ, এখনো পর্যন্ত কাপড় ব্যবহার করতে শেখে নি। শংকরকাকার কাছে শুনেছি, আন্দামান প্রশাসন আজকাল অনেক কিছুই করছে এদের জন্য। অনেক সময় এদের জন্য সমুদ্রতীরে ভালো খাবার, দামী জামাকাপড়, স্টেনলেস স্টিলের বাসনপত্রও রেখে দেওয়া হয়, তবু তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। জারোয়ারা এখনো জঙ্গলের ফলমূল, জঙ্গলের বুনো শূয়োর শিকার করে আগুনে ঝলসে খায়। এদের প্রধান অস্ত্র এখনো তীর ধনুক। এদের বিষাক্ত তীর কারো শরীরে বিঁধে গেলে অবধারিত মৃত্যু। তথাকথিত সভ্য মানুষদের এরা বিশ্বাস করে না। কোন রকমে একবার এদের চোখে পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে মৃত্যুবাণ। —বিষ মাখানো তীর।

জারোয়াদের সম্বন্ধে এত কথা শংকরকাকা বলেন নি আমাকে। জাহাজের সারেং ছেবরের সঙ্গে গল্প করতে করতে অনেক কিছু জেনেছি। ছেবর লোকটি বেশ ভালো। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। ওকে খুব পছন্দ হয়ে গেল আমার। তাছাড়া ছেবর সুন্দর গল্পও করতে পারে। অনেক গল্প আছে ওর ঝুলিতে। পরে জেনেছি, ছেবর আসলে 'লোকাল বর্ন'। মানে আন্দামানের জেলে দ্বীপান্তরী কয়েদীদের সন্তান। ওর ঠাকুরদা উত্তর প্রদেশের কোন এক গ্রামে নাকি থাকত। একদিন রাগের মাথায় কথা কাটাকাটি করতে করতে ওর ঠাকুরদা নাকি সুদের কারবারী মহাজনের ঘাড়ে বসিয়ে দিয়েছিল এক কোপ। সেই এক কোপেই কাবার আর তারপর আদালতের বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এই আন্দামানে। পরে ঠাকুরদা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এখানেই জমিজমা পেয়ে যায়। তখন উত্তর প্রদেশের গ্রাম থেকে ছেবরের বাবা-মা এখানে চলে আসে। ততদিনে অবশ্য ওর ঠাকুমা মারা গেছে। এখন অবশ্য ছেবরের বাবা-মা কিংবা ঠাকুরদা কেউ বেঁচে নেই। ছেবর নিজে ট্রেনিং নিয়ে জাহাজে কাজ করতে করতে এখন জাহাজের সারেং হয়ে বসেছে। আরো অবাক হবার মতো খবর, ছেবরের বউ নাকি বাঙ্গালী রিফিউজি মেয়ে।

ছেবরের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুভাষও বাঙালী রিফিউজি ছেলে, বয়স কুড়ি-বাইশ। ওর বাবা-মা লিটল আন্দামান দ্বীপে

সরকারের কাছ থেকে কিছু জমি-জিরেত পেয়েছে। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়ে এখন এই জাহাজের কলকব্জার কাজে হাত পাকাচ্ছে। ছেলেটা খুবই সৎ ও সাহসী। শংকর-কাকার বেয়ারা-কাম-রাঁধুনী টমাস, দক্ষিণ ভারতীয় খ্রিস্টান। বাংলা অল্প জানে, রান্নাও ভালোই করে, তবে দারুণ ভীতু। এজন্য জাহাজের সবাই খেপাত ওকে।

জাহাজ ছাড়লে আমরা তিনজনে তিনটে চেয়ার নিয়ে জাহাজের ডেকে বসলাম। সকালের মিঠে রোদ, সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া—সব মিলিয়ে বেশ ভালো লাগছিল। আমাদের সামনে টেবিলে ছড়ানো গোটা কয়েক মানচিত্র।

একটা মানচিত্রের ওপর পেনসিল রেখে কাকা বললেন, 'শংকর, এখন আমাদের দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপটাকে পুরোপুরি চক্কর মেরে রাটল্যাণ্ড দ্বীপের উত্তর দিয়ে যেতে হবে। ছেবরকে ঠিকমতো বুঝিয়ে দিয়েছিস তো?'

শংকরকাকা চটপট জবাব দিলেন, 'আরে বাবা, তোর ঘাবড়াবার কিছু নেই। ছেবর এ অঞ্চলের প্রত্যেকটা দ্বীপের নাড়িনক্ষত্র, ভূত ভবিষ্যৎ সবকিছু জানে। ওকে বেশি বললে আবার বিগড়ে যাবে। ওর যখন দরকার হবে, তখন নিজেই জিজ্ঞেস করে নেবে।'

সৃজনকাকা চুরুটে একটা টান মেরে বললেন, 'শংকর, এখানকার সবই ভালো, কেবল চুরুটটা হাওয়ায় বারবার নিভে যাচ্ছে। সমুদ্রে অ্যাডভেনচার করতে এসে দেখছি চুরুট খাওয়া ছাড়তে হবে।'

শংকরকাকা হাসলেন, 'এত বড় একটা অ্যাডভেনচারে এসেছিস, কিছু তো ছাড়তেই হবে। তবে পান খেতে পারিস। ছেবরের কাছে পানের ভালো স্টক আছে।'

শংকরকাকা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, বললেন, 'চল সৃজন, জাহাজের সবকিছু তোদের দেখিয়ে আনি। য়ু মাস্ট নো এভরি থিং—'

সৃজনকাকা হাসলেন, 'ইয়েস, এভরি থিং। কিন্তু জল-খাবার খেয়ে—'

শংকরকাকার সঙ্গে ঘুরে নেভিগেশনাল রুম, ইনজিন রুম, রেডিয়ো রুম ইত্যাদি সবকিছু বেশ ঘুরে ঘুরে দেখলাম। জানলাম কিভাবে জাহাজ চালাতে হয়। দেখলাম, সেক্সট্যান্ট যন্ত্র দিয়ে কি করে অকুল সমুদ্রের মধ্যে দিক নির্ণয় করতে হয়। আছে নেভিগেশনাল চার্ট—তাতে সমুদ্রের যাত্রাপথের সমস্ত নিশানা দেওয়া আছে। রেডিয়ো রুমে রয়েছে খবর পাঠানো আর পাওয়ার ব্যবস্থা। ওয়ারলেস অপারেশন একজন রেডিয়ো অফিসারের করার কথা, কিন্তু এই 'জারোয়া' জাহাজে ছেবর ও শংকরকাকা দুজনে মিলেই এই কাজটা চালিয়ে নিচ্ছেন।

শংকরকাকা নিজের কাছে একটা দু'নলা বন্দুকও রেখেছেন। বলা যায় না, কখন কি বিপদ আপদ হয়, কে জানে। এছাড়া রয়েছে খুবই শক্তিশালী একটা দূরবীন। এই দূরবীনটা কিন্তু দারুণ, কাকার দূরবীনের চেয়েও অনেক বড়। চোখে লাগিয়ে দেখলাম, জাহাজ থেকে সমুদ্রতীরের নারকেল গাছগুলোর ডাব পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দূরবীন চোখে লাগিয়ে দূরে সমুদ্র অথবা সমুদ্র সৈকতের দিকে তাকিয়ে থাকতে এত দারুণ লাগছিল যে শংকরকাকার কাছে দূরবীনটা চেয়েই বসলাম।

শংকরকাকা হেসে বললেন, 'সৃজন, তোর ভাইপোটির যখন এতই উৎসাহ তখন ওকেই এই জাহাজের 'পর্যবেক্ষণ অফিসার' করে দেওয়া যাক। জাহাজ থেকে চারিদিকে দূরবীন লাগিয়ে পর্যবেক্ষণ করবে। বলা যায় না, কখন কোন দিক থেকে শত্রু ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সৃজনকাকা গম্ভীরমুখে কী যেন ভাবছিলেন, শংকরকাকার কথার ভঙ্গীতে হেসে ফেলে বললেন, 'তথাস্তু—'

ক্রমে আমাদের জাহাজ পশ্চিমদিকে ঘুরল। রাটল্যাণ্ড দ্বীপের কাছে নোঙর করল আমাদের জাহাজ। জাহাজ থেকে একটা ছোট নৌকো নামানো হলো জলে। রাটল্যাণ্ড দ্বীপে একটু টহল দিয়ে আসতে হবে। সৃজনকাকা বললেন, 'তোর আর গিয়ে কাজ নেই। আমরাই ঘুরে আসি।'

সৃজনকাকা আর শংকরকাকা চলে গেলেন নৌকোয় চেপে। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছিল। কাল সারা রাত ঘুম হয় নি। কেবিনের নরম বিছানায় শুতেই দু'চোখ জুড়ে নেমে এলো যত রাজ্যের ঘুম।

এভাবে কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, ছেবরের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

'ওঠ, বাদলবাবু, চানটান সেরে খাওয়া দাওয়া করে নাও, সাহেবরা তো ফিরলেন না এখনো।'

কেবিনে একটা টাইম-পিস রাখা ছিল, দেখলাম প্রায় সাড়ে বারোটা। পেটের ক্ষিদেও বেশ চনচনে হয়ে উঠেছে। তাই ছেবরের কথা মতো চানটান সেরে খেয়ে নিলাম। টমাসের হাতের রান্না বেশ ভালো। মেনু ছিল ভাত, ডাল, সার্ডিন ভাজা, সামুদ্রিক লাল ভেটকির ঝাল আর আচার।

কাকারা ফিরলেন প্রায় দেড়টা নাগাদ। দুজনেই বেশ ক্লান্ত। কাকার হাতে বেশ বড় সাইজের সাদা প্রবাল। প্রবালটা দেখতে অদ্ভুত, যেন বিরাট একটা ড্রাগন হাঁ করে আছে। প্রবালের চেহারা দেখে আমি তো মুগ্ধ।

কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'শুধু প্রবাল পেলে? তেল-টেল কিছু পেলে না?'

কাকা হাসলেন, 'নারে! তেল-টেল পাওয়া কি এতই সহজ! তাছাড়া এই দ্বীপে তেলের সন্ধান পাব, তেমন আশা করি নি।'

আমাদের জাহাজ আবার চলতে শুরু করল। নীল জল কেটে আমাদের সাদা জাহাজ পতপত করে চলেছে। ডান-দিকে দক্ষিণ আন্দামানের পশ্চিমকূল। সমুদ্রসৈকত, নারকেল গাছের জটলা। তারপরই ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গল। বা দিকেও ছোট ছোট দ্বীপ। মনে হয়, কোন লোকজনের বাস নেই এসব দ্বীপে। একটু পরেই দেখা গেল সেণ্টিনেল দ্বীপ।

শংকরকাকা বললেন, 'এই যে দ্বীপটা দেখছিস এখানে থাকে একদল জংলী উপজাতি। শুধু জংলী নয়, কিছুটা হিংস্রও, তবে জারোয়াদের মতো নয়। এদের নাম সেণ্টিনেল।'

আমি বললাম, 'বাঃ, বেশ সুন্দর তো দ্বীপটা। এটায় নামবে না তোমরা?'

কাকা বললেন, 'নাঃ, এখন নয়, ফেরবার সময় দেখা যাবে।'

ক্রমে দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামল। বিকেলের লাল সূর্যের আভায় সমুদ্রের জল লাল। সে ভারী অপূর্ব দৃশ্য। মনে হলো যেন এমন অপরূপ দৃশ্য জীবনে আর কখনো দেখি নি। তবু মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায়।

সন্ধেবেলা জাহাজের ডেকে তিনটে চেয়ার নিয়ে বসেছি আমরা। ট্রানজিস্টারে গান হচ্ছে। বাংলা ও হিন্দি গানের অনুষ্ঠান। গান শেষ হলে খবর। পোর্ট ব্লেয়ার স্টেশন থেকে কে একজন খবর পড়ছে। খবর শুনে আমরা তো তাজ্জব, বেশ খানিকটা মুষড়ে পড়লাম।

খবরে বলল, ভারত সরকারের পেট্রোলিয়াম বিশেষজ্ঞ ডঃ শ্রীবাস্তবকে নাকি গতকাল রাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর একটু বাইরে বেরিয়েছিলেন পায়চারি করার জন্য। তারপর আর গেস্ট হাউসে ফিরে আসেন নি। পুলিশ এ ব্যাপারে খানাতল্লাশী চালাচ্ছে, তবে এখনো কোনরকম খোঁজখবর পাওয়া যায়নি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সত্যিই কি ভয়ংকর ব্যাপার! ডঃ শ্রীবাস্তবের মতো অমায়িক মানুষেরও তাহলে শত্রু থাকতে পারে। তবে কি কাকার সন্দেহই ঠিক? একদল আন্তর্জাতিক তেল-চোরের দল এই দ্বীপগুলিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

খবরটা শুনে বেশ খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন সৃজনকাকা। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে বললেন, দেখলি তো শংকর! আমি তোকে আগেই বলেছিলাম, আন্দামানের ওপর একদল আন্তর্জাতিক তেল চোরের নজর পড়েছে। তুই তো বিশ্বাসই করতে চাইছিলি না।'

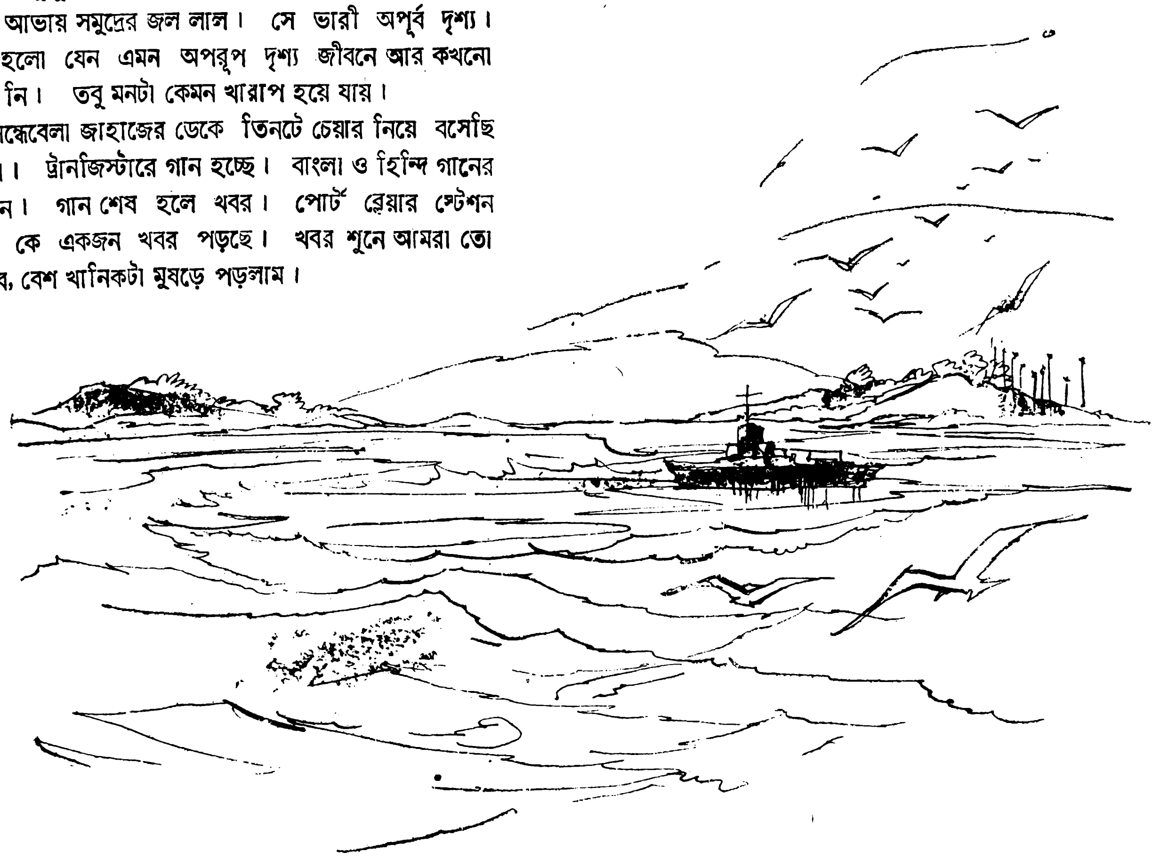

একটু পরে দেখা গেল সেণ্টিনেল দ্বীপ।

'কিন্তু এটা তো কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনাও হতে পারে। প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ তো নেই। এমনও তো হতে পারে, ডঃ শ্রীবাস্তব কয়েকটা ছিঁচকে গুণ্ডার হাতে পড়েছেন।'

'এখনো একথা বলবি তুই? আমার কাছ থেকে কতগুলি জরুরি ম্যাপ চুরি, খবরের কাগজে অমন বিজ্ঞাপন আর এখন ডঃ শ্রীবাস্তবের মতো আপনভোলা অমায়িক বৈজ্ঞানিকের উধাও হয়ে যাওয়া—এসব ব্যাপারকেও তুই বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলবি?'

শংকরকাকা কফির কাপে চমুক দিয়ে বললেন, 'নাঃ, তুই ঠিকই বলেছিস। ব্যাপারটা সত্যিই গুরুতর।'

'সুতরাং শংকর, এখন থেকে আমাদের আরো সাবধান হতে হবে। তাছাড়া যে কোন বিপদের মোকাবিলা করার জন্য রেডি থাকতে হবে।'

'তাহলে আমার মনে হয়, পোর্ট ব্লেয়ারে পুলিশকে আমাদের খবর জানিয়ে রাখা উচিত। যাতে সম্ভব হলে এদিকেও একটা পুলিশ বোট পাঠায়।'

আমি ফস করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু শংকরকাকা, এখান থেকে কী করে খবর পাঠাবেন? চিঠি তো পাঠানো যাবে না এখান থেকে।'

বোকার মতো প্রশ্ন শুনেও চটলেন না শংকরকাকা। বরং হাসিমুখেই জবাব দিলেন, 'সকালেই তো তোমাদের দেখালাম কী করে জাহাজ থেকে খবর পাঠাতে হয়। জাহাজে তো ওয়ারলেস সেট আছে।'

লজ্জায় জিভ কাটলাম আমি, 'সত্যিই তো।'

ছেবরকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন শংকরকাকা। ছেবর এসব কাজে ওস্তাদ। 'জো হুজুর' বলে ওয়ারলেস রুমের দিকে চলে গেল। খানিকক্ষণ পরেই ওই ঘর থেকে ভেসে এলো শব্দের ঢেউ...বীপ বীপ বীপ। বুঝলাম, আমাদের জাহাজ থেকে খবরের পর খবর যাচ্ছে পোর্ট ব্লেয়ারে।

জাহাজের স্টিয়ারিং এখন সুভাষের হাতে। রাতের অন্ধকারে বিলি কেটে আমাদের জাহাজ সাবধানে এগিয়ে চলেছে। টমাস রান্নাঘরে মুরগির রোস্ট বানানোয় ব্যস্ত। আমরা তিনজনে আপাতত চুপ করে বসে আছি। কিন্তু আমাদের চিন্তা আগামী দিনগুলোকে ঘিরে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে কে জানে! [চলবে]

জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

নিজে নিজে কর

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ॥ প্রতি খণ্ড দাম ১০৲

অর্দ্ধশত মডেলের নির্মাণ প্রণালী ও সার্কিট ডায়াগ্রাম সহ

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ॥ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

ওই উজ্জ্বলতা প্রথমে চোখে পড়েছিল শুধু বিক্রমের। মিঃ ওয়াদেকরের সেটা চোখে পড়ার কথা নয়। কারণ তিনি তখন অলসভাবে বসে ছিলেন আকাশযানের পেছন দিকে। বিক্রম মিঃ ওয়াদেকরের ক্রুম্যান। যুবা বয়স। মহাকাশ অভিযান তার জীবনে এই প্রথম। তাই উদ্যম উৎসাহ আর আনন্দ তার বলিষ্ঠ শরীরে যেন টগবগ করে ফুটছে সবসময়ে। একটা মৃদু উজ্জ্বল দীপ্তি চমৎকার নীলসাদা আলোকচ্ছটায় পরিণত হয়ে বিক্রমের দুই চোখ যেন ক্ষণিকের জন্য ঝলসে দিল। রোমাঞ্চিত সে। স্ক্রীনের বুকে তার চোখে আঠার মতো আটকে রইল দীর্ঘসময় ধরে। দূরত্বটুকু বোঝবার চেষ্টা করল সে। এখনও ওটা রয়েছে কিছু লাইটমিনিট দূরে। একটা গ্রহ! ক্রমশ অসাধারণ উজ্জ্বল আর আকারে বড় হতে দেখা যাচ্ছে! বিশাল এক নেক্‌লেসে গাঁথা চারখণ্ড মুক্তোর মতো ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে দু'জোড়া চাঁদ! এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য এর আগে জীবনে প্রত্যক্ষ করেনি বিক্রম। সে উত্তেজিত হয়ে আকাশযানের পিছনের অংশে নির্বিকারভাবে বসে থাকা মিঃ ওয়াদেকরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। কিন্তু খবর পেয়েও মিঃ ওয়াদেকর এলেন না তার পাশে।

বিক্রম আকাশযানকে গ্রহটির আরো কাছে নিয়ে গেল। মেঘের স্তরে স্তরে একটু একটু করে আলোর খেলা শুরু হল বিক্রমের চোখের সামনে। গাঢ় হতে লাগল নীল রঙ্। যেটাকে মেঘের প্রথম স্তর মনে হয়েছিল বিক্রমের, স্বল্পক্ষণ বাদেই সে বুঝতে পারল আসলে সেটা কী! জরুরী তলব পাঠিয়ে মিঃ ওয়াদেকরকে নিজের পাশে এবার ডেকে আনতে সক্ষম হল সে।

স্ক্রীনের বুকে জলের ছবি। হাওয়ার সওয়ার হয়ে দ্রুত গতিতে উড়ে যাচ্ছে কয়েক খণ্ড মেঘ। এছাড়া সমস্তটাই যেন এক নীলের জগত। দূরে অদূরে কিছু কিছু শ্বেত-শুভ্র তুষারমুকুট, বাকী অংশ শুধু জল আর জল। নতুন গ্রহ। জলময় বিশ্ব। বিক্রমের চোখে রোমাঞ্চকর বিস্ময়ের গভীর ঘোর লাগল!

'মিঃ ওয়াদেকর! আমি বাজি রেখে বলতে পারি এমন মনমাতানো দৃশ্য আপনি আগে কখনও দেখেননি।'

'ঠিক!' সমর্থনে মাথা নাড়তে লাগলেন মিঃ ওয়াদেকর। তিনি আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, 'এসো, নেমে পড়া যাক।'

শুনে সচমকে বিক্রম, 'কোথায়?'

'নিচে, ওই সদুদ্রে কারা বসবাস করে আমি দেখে যেতে চাই।'

অতঃপর ওদের আকাশযান স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে নেমে এল। আরো নেমে মেঘের অঞ্চলে পৌঁছে সমুদ্রের সঙ্গে রয়ে গেল প্রায় হাজার ফিট সমান্তরালে। নিচে দিগন্তবিস্তৃত রহস্যময় তরঙ্গ সঙ্কুল সমুদ্র অবস্থান করছে। স্ক্রীনকে পূর্ণবিবর্ধিত

করে জলের ভেতর অনুসন্ধানকার্য চালাতে লাগলেন ওরা। আশ্চর্য! সমুদ্রের বিশাল এলাকা ঘুরে কোন জাতের মাছ, বা জলে ভেসে-থাকা সমুদ্রশৈবালের চিহ্নও নজরে পড়ল না। মাঝে মধ্যে দেখা যায় লতাগুল্মের মতো কিছু ক্ষুদ্রাকার বৃক্ষের ভীড়। আকাশযানকে আরো শখানেক ফিট্ নিচে নামানো হল। এখন পর্যন্ত এটাকেই নিরাপদ দূরত্ব মনে হল ওদের। এবং দূরত্ব থেকেই ওরা দ্বীপটিকে আবিষ্কার করলেন। সমুদ্রের নীল-সবুজ জলের ওপর মাথা তুলে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে ছিল ওই দ্বীপ। আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচ মাইল এবং প্রস্থে দু'মাইলেরও কম!

দৃশ্যটিকে ক্যামেরাবন্দী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বিক্রম। এই গ্রহ, যেমনই হোক, ওদের নতুন আবিষ্কার। ওদের মহাশূন্য পরিক্রমার প্রধান উদ্দেশ্য আপাততঃ সফল। এর জন্য ওরা নিশ্চয় গর্ববোধ করতে পারে।

ইতিমধ্যে মিঃ ওয়াদেকর যানটিকে ধীরে ধীরে দ্বীপের মাথায় এনে প্রায় আটশ ফিটের উচ্চতায় রেখেছেন। দ্বীপের বুক সরু সুতোর মতো গাছপালায় আচ্ছাদিত যাদের রঙ্ ঠিক সবুজ না, বাদামী আর সবুজ রঙের সংমিশ্রণ। আশেপাশে এরকম আরো কোন দ্বীপ রয়েছে নাকি! শূন্য পথে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে রাডার যন্ত্রে দ্বিতীয় দ্বীপের অস্তিত্ব টের পেলেন ওরা। আকারে প্রথমটির চেয়ে বড়। উঁচু থেকে দ্বীপটাকে সিগারেটের মতো দেখাচ্ছিল।

গ্রহটির রাতের দিকে ঘুরে এল আকাশযান। বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। দিনের দিকে ফিরে এসে একটা দ্বীপে নামবার সিদ্ধান্ত নিলেন ওরা।

সমুদ্রের বালিয়াড়ি থেকে উঁকি মেরে মিঃ ওয়াদেকর বললেন, 'অদ্ভুত।' লম্বা কুণ্ঠিত খস্‌খসে সুতোর মতো সরু গাছগুলোর ওপর তার বিস্মিত দৃষ্টি আটকে থাকল বহুক্ষণ। তারপর প্রায় ফিস্‌ফিস করে বললেন, 'আমার কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না!'

অনেকক্ষণ চুপ করেই ছিল বিক্রম। এমন একটা নিরীহ নিরীহ দ্বীপে খারাপ কী আছে যা থেকে ওদের ক্ষতি হতে পারে? মিঃ ওয়াদেকরের কথা শুনে বিক্রম মনে মনে প্রশ্ন করল নিজেকে। এপাশে ঘুরতে ঘুরতে কিছু সংখ্যক চতুষ্পদ জীবের দেখা পেলেন ওরা। তবে প্রাণীগুলো নেহাৎ ক্ষুদ্রাকারের। আর-এক শ্রেণীর প্রাণীও রয়েছে, সংখ্যায় কম, এক একটি কুকুরের চেয়ে বড়।

মিঃ ওয়াদেকর অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'সাপ নেই তো, একটু সতর্ক থেকো হে বিক্রম।' এতক্ষণে বিক্রম মুখ খুলল, মজার ব্যাপার! ঝোপঝাড়ে কীটপতঙ্গের প্রায় অস্তিত্বই নেই।'

নিজেদের আকাশযান থেকে বেশী দূরে যেতে সাহস হয় না। স্থান এবং পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল না হয়ে আকাশযান থেকে নেমে পড়াও যাত্রীদের পক্ষে হটকারিতা। বিক্রম মিটারের রীডিং দেখে স্থানীয় আবহাওয়া ভাল বলার পর মিঃ ওয়াদেকর নিজের হেলমেট খুলেছিলেন। সমুদ্রতীর থেকে কিছুটা তফাতে নেমেছিল ওদের আকাশযান। নরম লাল রঙের বালির ওপর। ঠিক জঙ্গল না, অসংখ্য সরু সুতোর মতো গাছ ঘনসন্নিবদ্ধ হয়ে সোজা ওপর দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। খুব লম্বা গাছের দৈর্ঘ্যও দশ ফিটের বেশি নয়। ওই রকম সোজা মাথা তুলে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো বিক্রমের মনে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। চমৎকার হাওয়া বুকভরে টেনে নিয়ে আরাম পাওয়া যায়, কিন্তু গাছগুলো দেখা যায় অচঞ্চল, হাওয়া যেন তাদের স্পর্শ বাঁচিয়ে নিরন্তর বহে চলেছে।

ক্রমে একটু একটু করে অভিযাত্রীদ্বয়ের মনে আস্থা ফিরে আসে। ওদের কাছে আছে শক্তিশালী অস্ত্র। রয়েছে নিজেদের আকাশযানে অনাগত বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার নিখুঁত যান্ত্রিক ব্যবস্থা। একসময়ে যানের ভেতর থেকে ফোল্ডিং চেয়ার বের করে আনল বিক্রম। সন্ধ্যা সমাগমের অপেক্ষায় চেয়ারে বসে রইলেন দুই অভিযাত্রী।

'মিঃ ওয়াদেকর, আমি কিন্তু চাঁদগুলোর কথা চিন্তা করছি।' মিঃ ওয়াদেকরের মুখের ওপর চোখ রেখে বলল বিক্রম।

মিঃ ওয়াদেকর চিন্তিত গলায় বললেন, আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি, বিক্রম। একযোগে চারটি পূর্ণচন্দ্রের উদয় সমুদ্রজলে কী অকল্পনীয় জোয়ার সৃষ্টি করতে পারে। আর হয়তো তার পরিণতিতে এখানকার প্রায় সমস্ত ভূভাগ এক সময়ে জলের তলায় হারিয়ে গেছে।

বিক্রম বলল, সে গবেষণা যাদের ওপর ভার দেওয়া আছে, তারা করবেন। এখান থেকে ফিরে গিয়ে আমাদের বেস্-ক্যাম্পে শুধু রিপোর্ট দেওয়ার কথা।'

মিঃ ওয়াদেকরের মন থেকে চিন্তাটাকে অত সহজে দূর করা গেল না। সমুদ্রে জোয়ার। যখন দু'জোড়া পূর্ণচাঁদ এক যোগে প্রভাব খাটায়, তাদের আকর্ষণে অতি ভয়ঙ্করভাবে ফুলে ফেঁপে ওঠা সমুদ্রের সুবিপুল জলরাশির মহাদেশকে ক্ষয় করে খণ্ড খণ্ড করে দেবার অসীম শক্তি রয়েছে নিশ্চিত ভাবে। তার জন্যে সময় লাগতে পারে হয়তো লক্ষ কোটি বছর! যে দ্বীপের ওপর ওদের আকাশযান এখন অবস্থান করছে, যদি প্রচণ্ডতম জোয়ারগুলো এই গ্রহের দেশগুলোকে ক্রমশ গ্রাস করেই থাকে তাহলে এই দ্বীপ নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করছে কীভাবে, চন্দ্রচতুষ্টয় সৃষ্ট একটিমাত্র জোয়ারের বেলাতেই এদ্বীপের ভরাডুবি ছিল অবশ্যম্ভাবী। মিঃ ওয়াদেকর এমন কথাও চিন্তা করলেন হয়তো কয়েক শতাব্দী ধরে জোয়ারগুলো বহুদূরে সরে গেছে এখান থেকে। তার

আশঙ্কাপূর্ণ দৃষ্টি আকাশের দিকে ধাবিত হল। উদিত দুই চন্দ্রের পরস্পরের মধ্যে বর্তমান দূরত্ব অনেক। দেখে আশ্বস্ত হলেন মিঃ ওয়াদেকর। তার দৃষ্টি ফিরে এল সমুদ্রের দিকে।

প্রাণের ক্রমবিকাশ! লক্ষলক্ষ বছর সমুদ্রের তলায়, প্রথম উন্নত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পা রাখবার মতো জায়গা নেই। সেই জায়গা সৃষ্টি করার চেষ্টার ফল কি এই দ্বীপ, সামনে পিছনে তরঙ্গায়িত সমুদ্রতলে এমন কোন্ রহস্যময় লীলা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে কে বলতে পারে?

মনকে রীতিমত অস্থির করে রাখার মতো এ চিন্তা। রাত্রে নিজেদের যানের মধ্যে আশ্রয় নিয়েও মিঃ ওয়াদেকর সুখ বা আরাম পাচ্ছিলেন না। বিক্রমের অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। নেহাৎ ছেলেমানুষ। তাই এসম্পর্কে বেশি কথা বললেন না তাকে।

হঠাৎ মধ্যরাত্রে পাওয়া গেল সতর্ক সঙ্কেত! বাইরে একটা প্রাণী চোখে পড়ল ওদের। লোমেঢাকা রোগা চেহারা এমন এক অদ্ভুত ষষ্ঠপদ প্রাণী! হয়তো যথেষ্ট শক্তি ও ধরে ওই চেহারায়। আকাশযানের বাইরে জ্বেলে রাখা অনুজ্জ্বল আলোতে চাকিতের জন্যে চোখে পড়েছিল।

ওরা আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্ত নিলেন। যেহেতু এই গ্রহের পরিচয় জানা নেই, সম্পূর্ণ নতুন ঠেকছে এখানকার উদ্ভিদ্ এবং জীব জগতের কিছু কিছু নমুনা সংগ্রহ করতে যে সময়টুকু প্রয়োজন, তার বেশি মুহূর্তমাত্র অবস্থান করা হবে না। ওরা ফিরে যাবেন সোজা বেস্ক্যাম্পে প্রথম রাত কাটল নির্বিঘ্নে। পরদিন অতি প্রত্যূষে ওদের আকাশযান শূন্যপথে চক্র দিতে শুরু করল। ম্যাপিং রাডার রেকর্ড করল গ্রহের আকৃতি, দ্বীপগুলোর অবস্থান। প্রাণী-জগতের সন্ধানে দ্বীপগুলোর মাথার ওপর দিয়ে বারবার ঘুরে এলেন ওরা। আগের মতোই বেশীকিছু নজরে এল না। রাত্রে দেখা ওই বিচিত্র প্রাণী কয়েকটি দেখা গেছে। তবে সাপ এবং সরীসৃপ গোষ্ঠী অন্য প্রাণীর সংখ্যা অপ্রচুর নয়। জলে মাছ খুব কম চোখে পড়েছে। আশ্চর্য! একটাও পাখি নেই।

এক সময়ে মিঃ ওয়াদেকর বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, বিক্রম! এমন একটা সুবিশাল সমুদ্রে জীবনের সাড়া এত কম কেন ভাবা যায় না, হে। সমুদ্র! জীবদের শুরু তো এখানেই। তবে কি এ সমুদ্রে এমন কোন দানবিক চেহারার প্রাণী দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করে যাচ্ছে যারা ধ্বংস করে দিয়েছে ছোট বড় মাঝারি আকারের অধিকাংশ প্রাণীকে। কোথাও একটা শেলফিস পর্যন্ত চোখে পড়ল না। কাঁকড়া শামুক এমনকি অতিক্ষুদ্র কোন সামুদ্রিক প্রাণীও না! সমুদ্র-সৈকতে রয়েছে শুধু মরাবালির স্তূপ। আশ্চর্য।

মিঃ ওয়াদেকরের অভিজ্ঞতা বলে, এমন হয় না কোথাও। প্রাণের অস্তিত্ব আর তার নানান্ চিহ্ন ওর দেখা সমস্ত সমুদ্র-বেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে প্রচুর পরিমাণে। এখানে সেটার। অভাব তাই মিঃওয়াদেকরের মনে ক্রমশ একটা অজানা ভাবে জন্ম দেয়। তিনি সমুদ্রজলের নমুনা সংগ্রহ করে বিক্রমকে নিয়ে দ্রুতপায়ে ফিরে এলেন আকাশযানের ভেতর।

বিক্রম যানের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে বলল, কম্প্যুটার ওই চাঁদগুলোর কক্ষপথের হিসেব কষে রেখেছে। চারটি চাঁদের একসঙ্গে মিলন ঘটে প্রতি একশ'বারো বছর অন্তর। তার ফলে এখানকার সমুদ্রে যে জোয়ার আসে, তাতে জলের উচ্চতা বাড়ে ছয়শ' ফিটের ওপর।'

মিঃ ওয়াদেকর বললেন, 'আমার ধারণা যে কোন দ্বীপ তাহলে অন্ততঃ চারশ' ফিট জলের তলায় চলে যাবে।'

শুনে বিস্ময় বিমূঢ় গলায় বিক্রম বলল, 'যদি সেরকমই ঘটে তাহলে এই দ্বীপের প্রাণীরা এল কোথা থেকে? জোয়ারের জলে ডুবে মরে যাওয়ার কথা!'

'ঠিক বলেছো। জলে আর ডাঙায় ঘুরে বেড়ানো উভচর প্রাণী এরা নয়। তাহলে কি এরা প্রতি একশ বছরে বিবর্ধিত হওয়া নতুন প্রাণীর এক একটা দল? দ্বীপের চেহারা প্রকৃতি ইত্যাদি লক্ষ্য করতে করতে আমার এখন মনে হচ্ছে, সমুদ্রের বুকে এই দ্বীপ আসল না, কৃত্রিম! হয়তো সমুদ্রের তলদেশে যারা বসবাস করে এই দ্বীপ পুনরধিষ্ঠিত হয়েছে তাদের দ্বারাই। নিখিল সৃষ্টি ব্যাপী তো এমন কাণ্ডই চলেছে। বিবর্তন! বিবর্তন! পরিবর্তন আর মানিয়ে নেওয়ার কাজ। শুধু এখানে স্তন্যপায়ী প্রাণীরা যখন ডাঙায় আসা শুরু করল, বিস্তৃত হওয়ার মতো জায়গার অভাব ঘটল তাদের এবং প্রতি একশ' বছরের পর বিপুল ভয়ঙ্কর জোয়ারের জল তাদের অস্তিত্বকে ডুবিয়ে ধুয়ে মুছে সাফ্ করেছিল। কিন্তু বিবর্তন কখনও থেমে থাকে না, বিক্রম! সমুদ্রের তলাতেও তা অব্যাহত থাকে। পরিণামে প্রকাশ ঘটে আরো এক বুদ্ধিমান প্রাণীর। তারা কতদূর উন্নত আমরা অবশ্যি কল্পনা করতে পারছি না। সমুদ্রের বুকে এই কৃত্রিম দ্বীপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যও জানা নেই।'

বিক্রম উদ্ভিদ্‌জগতের কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছিল। তার সংগ্রহে আরো ছিল একটা ছোট আকারের সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। কিন্তু যানের মধ্যে বিপদ সঙ্কেত জাগিয়ে তোলার জন্যে দায়ী চাকিতের জন্যে ওদের দেখা সেই রোগা রোগা অথচ শক্তিধর রহস্যময় প্রাণীর একটা নমুনা বেস্ক্যাম্পে নিয়ে যেতেই হবে। রোখ চেপে গিয়েছিল বিক্রমের। মিঃ ওয়াদেকর কিছুটা ইতঃস্তত করে বিক্রমকে অনুমতি দিয়ে-ছিলেন ওই বিশেষ কাজটি করতে। অবশ্যই সতর্ক করে দিয়েছিলেন বারবার। বিক্রম সবদিক দিয়ে তৈরি হয়ে

আকাশযান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সময় কাটে, কিন্তু বিক্রম আর ওদের যানের মধ্যে ফিরে আসে না। ক্রমশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন মিঃ ওয়াদেকর। দেখতে দেখতে প্রায় ঘণ্টা তিন সময় অতিবাহিত, কোথায় গেল ছেলেটা, ওর কাজটা যে সহজ না, বোঝানো যায় নি। মিঃ ওয়াদেকরকে রীতিমতো দুশ্চিন্তার মধ্যে রাখল সে! তার প্রতীক্ষায় আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাও তো যায় না! খুঁজে দেখতে হবে।

আকাশযান থেকে বেরিয়ে পড়ার আগে যানটি সম্পর্কে নিয়মানুযায়ী সমস্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সমাধা করে রাখলেন তিনি। যানটির দু'শ ফিটের মধ্যে যদি কেউ বা কিছু এসে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে এ্যালার্মস্ক্রীন সেই অবাঞ্ছিত আগমনবার্তা চারপাশে তীব্র জোরালো সুরে দেবে ছড়িয়ে। মিঃ ওয়াদেকর ফিরে আসার আগে বিক্রম ফিরে এলে অবশ্য নিশ্চুপই থাকবে এ্যালার্মস্ক্রীন। কারন যন্ত্রটা ওভাবে তৈরি। ওদের দু'জনের কণ্ঠস্বরের শব্দের ধরণ ওই যন্ত্রে নিবদ্ধভুক্ত করে রাখা হয়েছে। আগে ফিরে এসে মিঃ ওয়াদেকরকে আকাশযানের ভেতর না তার আশপাশে দেখতে না পেলে বিক্রম এ্যালার্মস্ক্রীন দেখেই বুঝবে সেটাকে চালু করে রেখে অন্য কোথাও গিয়েছেন তিনি। এবং যদি শেষ পর্যন্ত ওদের দু'জনের কেউই না ফিরে আসতে পারেন, তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজেই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আত্মহত্যা করবে এই আকাশযান!

বিক্রমের পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে এগোতে লাগলেন মিঃ ওয়াদেকর। নিঃশব্দে এগোতে এগোতে এক জায়গায় লক্ষ্য করলেন পদচিহ্ন হঠাৎ দিক পরিবর্তন করে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। মিঃ ওয়াদেকরও জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন। অপেক্ষাকৃত একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। বিক্রমের পায়ের চিহ্ন অস্পষ্ট এখানে। সতর্ক চোখে খুঁজতে খুঁজতে ফের দেখা গেল জঙ্গলের আরো গভীরে ঢুকে গেছে সেটা। হঠাৎ শোনা গেল একটা সুতীক্ষ্ণ সুরেলা আওয়াজ। মিঃ ওয়াদেকরকে ঘিরে যেন চমকে জেগে উঠল জঙ্গলের সমস্ত বৃক্ষলতা গাছগাছালি! কিছু একটা গিয়েছিল আকাশযানের কাছে। মিঃ ওয়াদেকর অস্থিরভাবে চিন্তা করলেন। তবে নিশ্চয়ই বিক্রম না। একটা অজানা আতঙ্কের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলেন তিনি। হাতের অস্ত্র প্রস্তুত রেখে আরো দু'চার কদম এগিয়ে গেলেন জঙ্গলের মধ্যে এতক্ষণ বাদে চীৎকার করে বললেন, 'বিক্রম! কোথায় তুমি?'

একটা গর্তের মুখে ঘাসের আচ্ছাদন ছিল জানতেন না, বুঝতেও পারেন নি। ওই জায়গাতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পড়ে গেলেন মুখ থুবড়ে। পায়ের চারপাশে কঠিন দাঁতের কামড় অনুভূত হল। ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল যেন পায়ের হাড়। হিমশীতল আতঙ্কের সঙ্গে তিনি অনুমান করলেন গর্তের ভেতর কোন হিংস্র প্রাণী না, ছিল চোখের আড়ালে পেতে রাখা একটা ধাতব ফাঁদ! অপরিসীম যন্ত্রণায় তার সর্বাঙ্গ নীল হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ! বিক্রমও কি তাহলে আর কোথাও তারই মতো অবস্থায় পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করছে এখন? কিন্তু কারা রেখেছিল এই মৃত্যুফাঁদ পেতে, ফাঁদে শিকার পড়েছে কিনা তারা দেখতে আসবে নাকি একবারও? সেই বুদ্ধিমান কৌশলী প্রাণীদের অন্ততঃ একজনকেও কি দেখতে পাবেন না মিঃ ওয়াদেকর? তারা কি রাত্রে ফাঁদ পেতে রেখে ফের সমুদ্রে ফিরে গিয়েছিল নাকি? আকাশযানটাকে গোড়া থেকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য রেখেছিল তারা। সমুদ্রবাসী প্রাণীগুলো কতটা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ধরে তাদের মগজে? প্রযুক্তিবিদ্যায় হয়তো পৃথিবীর খুব পেছনে তারা নেই। ভিন গ্রহ থেকে আসা আকাশযানটিকে নিজেদের দখলে আনার জরুরী প্রয়োজন হয়তো উপলব্ধি করেছে তারা। তাই কি যাত্রীদের ওই যান থেকে এভাবে হঠিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছিল?

আকাশযান নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও! একটা টিক্‌টিক্ আওয়াজ বেরিয়ে আসছে সেটার ভেতর থেকে। যন্ত্রের একটা লাল কাঁটা ওইভাবে টিক্‌টিক্ করে ঘুরে শূন্য অঙ্কে পৌঁছানোমাত্র আকাশযানটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজে ধ্বংস হয়ে যাবে এ তথ্য জানা নেই এই গ্রহবাসীদের। তারা ভিনগ্রহী প্রাণীদের হঠাৎ আগমন দেখে মস্ত এক সমাস্যায় পড়েছে। এই দ্বিপদ প্রাণীরা কেমন? কারা এরা? এল কোথা থেকে? সফেন সমুদ্রবেলায় সভয় কৌতূহল নিয়ে দলে দলে জমায়েত হতে লাগল লোমেঢাকা রোগা রোগা চেহারার ষষ্ঠপদ শক্তিধর প্রাণীগুলো। তাদের কাছে সময় কোন সমস্যা নয়। কী ঘটে না ঘটে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল তারা প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে!

165/6 ধর্মতলা রোড, সালকিয়া, হাওড়া-6

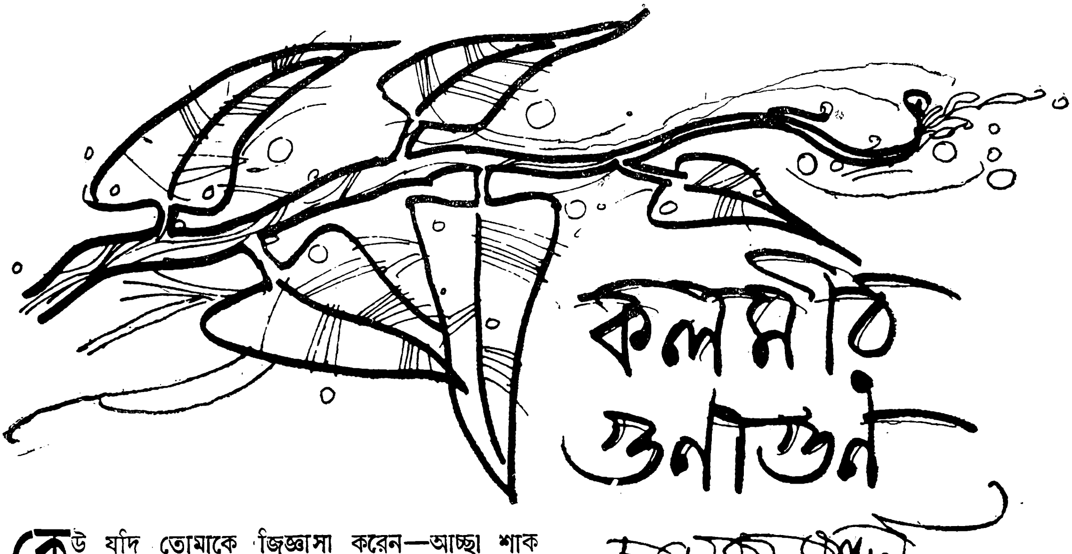

কলমীর গুণাগুণ

ছন্দোময় মণ্ডল

কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন—আচ্ছা শাক খেতে তোমার ভালো লাগে? তুমি কি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবে, হ্যাঁ, উঁহু শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা কোরো না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমার শাক খেতে ভালো লাগে না। যা তিক্ত, ওগুলো খেতে আবার কারো ভালো লাগে নাকি? মা-মাসিরা কেন-যে জোর করে খাওয়ায় তা বুঝি না! সাধারণভাবে এই চিন্তা আমাদের সকলেরই। কিন্তু না, শাকের গুণ অনেক, এসো, আজ তোমাদের কলমীর গুণপনা শোনাই।

শাকেদের মধ্যে কলমী অন্যতম। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের ভাষায় গাছটির নাম Ipomoea Reptans। কলমীর গোত্র বা family হচ্ছে volvulaceae। গাছটি অন্যান্য শাকের মতোই আকারে ছোটো হলেও গুণ অনেক। কারো কোষ্ঠ-কাঠিন্য হয়েছে, গরম দুধে বিশ বাইশ ফোঁটা কলমীর রস মিশিয়ে খাওয়ালে দেখবে উপকার হয়েছে। না না, এটা নিতান্তই টোটকা নয়, এই ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। কলমীর মধ্যে সাত শতাংশেরও বেশি 'রেজিন' মানে রজন জাতীয় বিভিন্ন জিনিস রয়েছে, যা অন্ত্রের বিশেষতঃ বৃহদন্ত্রের নড়াচড়া বিশেষ ভাবে বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া, এতে কিছু হাইড্রোকার্বন, দু-একটি ফ্যাটি অ্যাসিড, যেমন—মেলিসিক, বিহেনিক, বিউটারিক, মাইরেসটিক এগুলোও আছে, তাছাড়া কলমীকে পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচাতে গাছে 'স্টেরল' তৈরি হয়। আমাদের শরীরের অনেকগুলো হর্মোনও স্টেরল জাতীয় জিনিস। আবার মায়েদের বিশেষত যেখানে শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় দুধটুকুও নেই, তিন চার চামচ কলমীর রস ঘিয়ে সাঁতলে দুবেলা খেলে দুধ বাড়ে। দু-চার চামচ কলমীর রস একটু দুধের সঙ্গে মিশিয়ে রোজ সকালে খেলে বসন্ত হবার ভয় থাকে না।

একটা কথা শুনে থাকবে—বর্ষাকালে কলমী শাক খাওয়া নিষেধ। কলমী জলজ লতা, বর্ষাকালে সাপখোপ লুকিয়ে থাকার আদর্শ জায়গা। তাছাড়া লক্ষ্য করলে দেখবে বর্ষাকালে কলমী কেমন যেন হড়হড়ে হয়ে যায় অর্থাৎ ওতে Mucilenegons Secretion বাড়ে। আর শাক মানেই তো সেলুলোজ, তাতে মিউসিন বাড়ায় বর্ষাকালে শাকপাতা বেশি খেলে পেটের গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে।

কেউ কেউ লক্ষ্য করে থাকবে গরমের দুপুরে কলমী শাক দিয়ে ভাত খেলে বেশ ঘুম আসে। শুধু ভাতের জন্যেই নয়, শাকের জন্যও এটা হতে পারে। দেখবে, অনেক কবরেজমশাই আফিং-এর বিষক্রিয়া কাটাতে কলমীর রস খাওয়াতে বলেন। এখানে তোমাদের মনে একটা দ্বন্দ্ব হয়ত উপস্থিত হবে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো আফিং-এর ঝিমুনির জন্য 'মরফিন' নামে একশ্রেণীর উপক্ষার দায়ী। তাহলে কলমী যদি আফিং-এর ঘোর কাটায়, তাহলে কলমী খেলে তো উল্টে ঘুম ছুটে যাবার কথা।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা যাক। আফিং-এর বিষক্রিয়ার লক্ষণ হচ্ছে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট আর রক্তচাপ কমা, কলমীর রস খাইয়ে দিলে এটা ঠিক হয়ে যায়। বেশি ডোজে 'মরফিন' মস্তিষ্কের শ্বাসকেন্দ্রকে দমিয়ে দেওয়াতেই এইসব উপসর্গ দেখা দেয়। কিন্তু কলমীর রসে থাকে 'ন্যালরফিন' বলে এক ধরনের উপক্ষার। এটা মরফিনের প্রতিষেধক, মজার কথা এই, এটাও রাসায়নিক দিক দিয়ে মরফিনেরই সমগোত্র, তবে ন্যালরফিন কিছুটা কমজোরী। মরফিনের

উপর ন্যালরফিন দিলে কে গিয়ে স্নায়ুকেন্দ্রগুলো দখল করবে, এই নিয়ে রেষারেষি হবে, যার ফলে মাঝখান থেকে মরফিনের বিষক্রিয়া যাবে কমে, আর স্বাভাবিক সুস্থ শরীরে মরফিন না থাকায় এই ধরনের প্রতিষেধকও মরফিনের মতোই কাজ করবে, তাতে ঘুম তো পেতেই পারে।

আর একটা কথা। তোমাদের মধ্যে দু-একজন নিশ্চয়ই একটু ডানপিটে আছো। তাদের জন্য বলি, বাড়ির আশে-পাশে মৌমাছির চাক ভাঙতে গিয়ে মৌমাছির কামড় খেলে বা বোলতা হুল ফোটালে তীব্র যন্ত্রণা কমাতে সঙ্গে সঙ্গে কলমী শাক বেটে ঐ জায়গায় লাগালে দেখবে বেদনা অনেক কমে যাবে। মরফিন জাতীয় উপক্ষার ন্যালরফিনের উপস্থিতিই এর কারণ। কারো কারো তো মাঝে মধ্যে ফোঁড়াও হয়ে থাকে। যেখানে ফোঁড়া, ভেতরে পুঁজ অথচ মুখ নেই বলে বেরোতে পারছে না, সেখানে কলমীর শেকড় আর ডগা একসঙ্গে বেটে লাগালে ফেটে যাবে। এটা সহজেই পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

বি-15/77, লেক প্লেস, কল্যাণী-741-235, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

থার্মোমিটার কে আবিষ্কার করেছিলেন

লতিকা দত্ত

তাপ সম্পর্কীয় বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে প্রাথমিক প্রয়োজন হলো কি করে তাপমাত্রা মাপা যায়। এই প্রয়োজন মেটাতেই থার্মোমিটারের আবিষ্কার হলো। থার্মো (Thermo) মানে হলো তাপ ও মিটার (meter) মানে হলো মাপা। সুতরাং থার্মোমিটার হলো যা তাপের মাত্রা মাপে।

থার্মোমিটার সম্পর্কে প্রথম চাহিদাই হবে এটি যেন একই তাপমাত্রায় সব সময় একই মাত্রার নির্দেশ দেয়। এই প্রয়োজনীয় কথাটি মাথায় রেখে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও পনেরো শ' বিরানব্বইয়ের দিকে পরীক্ষা করে এক প্রকার থার্মোমিটার তৈরি করলেন। তিনি একটি কাঁচের নল নিয়েছিলেন। এই নলটির একপ্রান্তে একটি ফাঁপা বাল্‌ব্‌ ছিল। তপ্ত করে নল ও বাল্‌ব্‌ দুটোরই ভেতরের বায়ুর আয়তন বাড়ানো হতো। নলের খোলা দিকটি কোন তরল পদার্থ যেমন জলে ডুবানো থাকত। এবারে নলের ভেতরকার বায়ু যখন ঠাণ্ডা হতো, ভেতরের বায়ু সংকুচিত হত ও তার আয়তন কমে যেত। তরল পদার্থটি তখন নলের খালি জায়গা ভর্তি করতে নলে উঠে যেত। নলের ভেতরকার তরল পদার্থের ওপরের লেবেল ওঠা ও নামার পরিমাপ দিয়ে তাপমাত্রার পরিবর্তন মাপা যেত। সুতরাং বলা যায়—এখানে আমরা প্রথম থার্মোমিটার পেলাম কারণ এটি তাপের মাত্রা মাপার কাজ করেছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে তাপের সঙ্গে নলের ভেতরকার বায়ুর প্রসারণ ও সংকোচন ধর্মই এখানে তাপের মাত্রা মাপে। তাই, এই থার্মোমিটার নিয়ে একটি সমস্যা দেখা দিল। সমস্যাটি হলো এই যে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পরিবর্তন একে প্রভাবিত করে। সুতরাং এই থার্মোমিটারে মাপার কাজটা নির্ভুল নয়।

আজকাল আমরা যে থার্মোমিটার ব্যবহার করি তা তরল পদার্থের প্রসারণ ও সংকোচনের ধর্মের সাহায্যে তাপের মাত্রা মাপে। এই তরল জিনিসটি, ভালোভাবে আটকানো একটি কাঁচের বলবে রাখা হয়—এতে বাতাস ঢুকতে পারে না। এই বাল্‌বের সঙ্গে একটি সরু কাঁচের নল সংযুক্ত থাকে। উঁচু তাপমাত্রায় তরল পদার্থটির প্রসারণ ঘটে এবং নলের ওপর দিকে উঠে যায়। নিচু তাপমাত্রায় তরল পদার্থটির সংকোচন ঘটে এবং তখন তা নলের নিচের দিকে নেবে যায়। নলের গায়ে স্কেল আছে। স্কেলে তরল পদার্থের লেবেল দেখে তাপমাত্রা জানতে পারি।

100, বোধপুর পার্ক, কলকাতা-700 068।

মৌলিক পদার্থের নামকরণ

ডঃ নিত্যগোপাল বসু

অমিত হঠাৎই প্রশ্ন করে—'আচ্ছা, কাকু, মৌলিক পদার্থরা তাদের এমন অদ্ভুত অদ্ভুত নাম পেলো কেমন করে ? সোডিয়ামের নাম তো হতে পারতো রুবিডিয়াম কিংবা ম্যাগনেসিয়ামের নাম ইউরেনিয়াম।

এমন প্রশ্নে আমি বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। কিন্তু নাছোড়বান্দা অমিত উত্তর না পেলে তো একপাও নড়বে না। মার্চ মাসের বিকাল। অশ্বত্থগাছে নতুন পাতা এসেছে—তামাটে কিশলয়। দখিনা বাতাস বয়ে চলেছে। একটা কোকিল ডেকে চলেছে সে কখন থেকে।

থ্যালিয়াম আবিষ্কার হয়েছে এমন এক বসন্ত কালে। বসন্তের কিশলয় (Budding Twig)—Thallos কথা থেকে এমন নামকরণ—থ্যালিয়াম।

শহরের নামে অনেক মৌলিক পদার্থ তাদের নাম পেয়েছে যেমন ম্যাগনেসিয়াম। এশিয়া মাইনরের অতীত নাম 'ম্যাগনেসিয়া'। তা থেকে ম্যাগনেসিয়াম। কোপেন-হেগেনের ল্যাটিন নাম থেকে হ্যাফনিয়ামের নাম দেওয়া হয়েছে। স্টকহোমের ল্যাটিননাম—'হোলমিয়া' যা থেকে এসেছে – হোলমিয়াম। প্যারিসের ল্যাটিন নাম লিউটেশিয়া —(Lutetia)—যা থেকে লিউটেশিয়াম। স্কটল্যাণ্ডের ছোট্ট এক গ্রামের নাম—'স্ট্রনশিয়ান'। তা থেকে স্ট্রনশিয়াম। 1787 সালে সুইডেনের 'ইটারবি' (Ytterby) গ্রামের নাম থেকে চারটে ধাতুর নামকরণ হয়েছে—ইট্রিয়াম, ইটার-বিয়াম টারবিয়াম, ও আরবিয়াম। ঐ গ্রাম থেকে যে খনিজ পদার্থ পাওয়া গিয়েছিলো—তা থেকে ঐ চারটে মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার হয়। পৃথিবীতে অন্য কোন জায়গা, শহর বা দেশ তার নামে চারটে মৌলিক পদার্থের নামকরণ হবার সৌভাগ্য লাভ করে নি।

মৌলিক পদার্থ স্ক্যাণ্ডিয়াম-এর নামকরণ হয়েছে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার নামানুসারে। জার্মানীর রাইন প্রভিন্সের নামানুসারে রেনিয়াম, ইউরোপের নামে ইউরোপিয়াম। মেরি কুরি তাঁর দ্বিতীয় আবিষ্কার পোলোনিয়ামের নামকরণ করেন তাঁর জন্মভূমি পোলাণ্ডের নামে। ফ্রান্সের নামে নাম দেওয়া হয়েছে দুটো ধাতুর—ফ্রান্সিয়াম ও গ্যালিয়াম। ফ্রান্সের ল্যাটিন নাম—গ্যালিয়া। অবশ্য নিন্দুকেরা বলে আবিষ্কর্তা 'Lecog de Boisdaudran' তাঁর নাম কৌশলে ঢুকিয়ে দেন দেশের নামের মধ্যে। Le-Cog মানে The cock, আর ল্যাটিন ভাষায় cock কে বলে gallus। তা থেকে গ্যালিয়াম।

রঙের নামে বহু মৌলিক পদার্থ তাদের নাম পেয়েছে। ক্রোমিয়ামের লবনগুলো বিভিন্ন বর্ণের হয়। তাই Chromia অর্থাৎ 'রং' থেকে মৌলিক পদার্থটি এর নাম পেল ক্রোমিয়াম। ইরিডিয়াম-এর নামকরণ হয়েছে 'iris' বা রামধনু রঙের লবন তৈরী করে বলে। রোডিয়ামের (Rhodium) লবন হালকা গোলাপী বর্ণের Rhodon বা গোলাপী রং থেকে এর নাম হয়েছে রোডিয়াম। আবার কোনো কোনো ধাতু শিখার রং পরিবর্তন করতে সমর্থ। যেমন সোডিয়াম হলদে সোনালী শিখা দেয়, তামা হালকা সবুজ রঙের শিখা দেয়। রুবিডিয়ামের শিখার রং লাল। আর ল্যাটিন-ভাষায় লালকে বলে 'রুবিডাস্' (Rubidus)। সিজিয়াস কথার মানে আকাশী নীল (Sky blue ≡ Caesius), সিজিয়াস আকাশী নীল শিখা দেয় বলে এর নাম সিজিয়াম। ইণ্ডিয়াম এসেছে ভারতীয় কালচে নীল রং (Dark-blue dye) থেকে, কেননা—ইণ্ডিয়াম স্পেকট্রোস্কোপিতে উজ্জ্বল-নীল রং তৈরী করে।

দেবদেবীর নামে মৌলিক পদার্থের অনেক নামকরণ হয়েছে। স্ক্যাণ্ডিনোভিয়ান দেবী ভ্যানাডিস (vanadis) থেকে এসেছে ভ্যানাডিয়াম। তাদের যুদ্ধের দেবতা 'থর' থেকে এসেছে থোরিয়াম। ট্যাণ্টালাসের নাম থেকে হয়েছে ট্যাণ্টালাম। ট্যাণ্টালাস হল গ্রীক উপকথার এক রাজা। এঁর মেয়ে রাজকন্যা নিয়োব (Niobe) থেকে এসেছে নিয়োবিয়াম। গ্রীক দেবতা টাইটান থেকে এসেছে টাইটা-নিয়াম। দুঃসাহসী যুবক প্রোমিথিউস দেবতাদের কাছ থেকে আগুন চুরি করে এনেছিলো। সেই প্রোমিথিউসের নামে প্রোমিথিয়াম। জার্মানদের দুষ্ট আত্মা (evil spirit)-কে বলে Kobald। আর যে খনিজ থেকে কোবাল্ট আবিষ্কৃত হয়েছিলো তা ছিলো বিষাক্ত। তাই 'Kobald' কথা থেকে কোবাল্টের নাম করণ হয়েছে।

বহু বিজ্ঞানীদের নামে বহু মৌলিক পদার্থের নামকরণ হয়েছে, এদের সম্মানার্থে। এনরিকো ফার্মির নামে ফার্মিয়াম ; আলবার্ট আইনস্টাইনের নামে আইনস্টাইনিয়াম। আলফ্রেড নোবেলের নামে নোবেলিয়াম, মেরি ও পীয়ের ক্যুরির নামে

'ক্যুরিয়াম' (Curium), বিজ্ঞানী লরেন্সের নামে লরেনিয়াম। গ্রহ উপগ্রহের নামেও কয়েকটা মৌলিক পদার্থের নামকরণ হয়েছে। ইউরেনাসের নামে ইউরেনিয়াম, নেপচুনের নামে নেপচুনিয়াম, প্লুটোর নামে প্লুটোনিয়াম।

সুনন্দা বৌদি এমন সময় চা নিয়ে এলেন। অমিতের জন্য দুধ। গরম ওমলেটের গন্ধে ঘর ভরে গেল।

—'এই ভর সন্ধেবেলা কাকু-ভাইপো ঘরের মধ্যে বসে কি নিয়ে আড্ডা হচ্ছে?'

—এখন কোনো কথা নয়, মা—অমিত মাকে বাধা দেয়। তারপর কাকু—?

—প্যালাডিয়াম ধাতুর নামকরণ হয়েছে প্যালাস গ্রহাণুপুঞ্জের (Asteroid pallas) এর নামে। উপগ্রহ সিরিসের নামে সিরিয়াম। আমি থামলাম। অমিত বললে—তারপর? আমি জবাব দিলাম—আমার গল্পটি ফুরোলো। ততক্ষণে চা ওমলেট শেষ। খানিকটা সময় অন্যমনস্ক থেকে অমিত উৎসাহে বলে উঠলো—আমি যে মৌলিক পদার্থ—আবিষ্কার করবো নাম দেবো তার—অমিতোনিয়াম। কেমন হবে কাকু?

হেসে জবাব দিলাম—দারুন হবে। তারপর বিদায় নিয়ে নেমে পড়লাম রাস্তায়। বসন্তের সন্ধ্যা। বাতাস বইছে ধীরে।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান, 99 শরৎ বোস রোড, কল-26

ছড়া

যে কোন একটি

তপোময় ঘোষ

পারমানবিক বোমা ফাটলে
মানবিক কিছু থাকবে না।
এখন দ্যাখো, পারমানবিক না
মানবিক কিছু রাখবে না!

অনুষ্ঠানে মাইক বাজলে
অমায়িক কিছু থাকবে না।
এখন দ্যাখো, মাইক না
অমায়িক কিছু রাখবে না?

ঘনাদার স্রষ্টা

রবীন বল

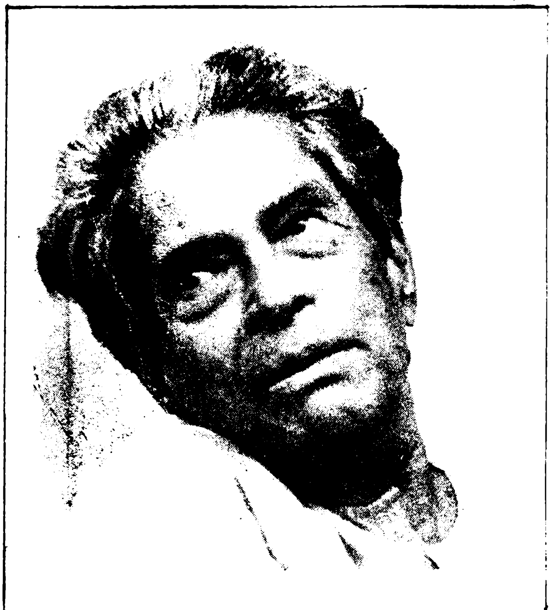

উনিশ শো পঁয়ষট্টি, নাকি ছেষট্টিই হবে।

তখন প্রেমেন্দ্র মিত্র যুগান্তরের 'ছোটদের পাততাড়ি' বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন। আমার প্রকাশক জীবনের শুরুও প্রায় সেই সময় থেকেই। অবশ্য তার কয়েক বছর আগে থেকেই শিশুদের বিদ্যালয় পাঠ্য কিছু কিছু বই ছাপা শুরু করেছি। সেই সূত্রেই আলাপ হয়েছে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ধীরেন বলের সঙ্গে। তিনি তখন ছোটদের পাততাড়িতে নিয়মিত ছবি আঁকেন। তিনিই প্রেমেনদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

প্রথম পরিচয়ের দিন—আমাদের আদি বাড়ী ঢাকার কাগজীটোলায় শুনে তিনি বলেছিলেন, 'জানো রবীন, ঢাকা হচ্ছে আমার সেকেণ্ড হোমল্যাণ্ড। ঢাকায় না গেলে আমার সায়েন্স পড়াও হত না, হয়তো সায়েন্স ফিকসনও লেখা হত না। তোমাদের বাড়ী কাগজীটোলায়—আর আমি থাকতাম টিকাটুলিতে।'

মূল ঢাকা শহরের উপকণ্ঠেই নাকি এই দুটি জায়গার অবস্থান – যেখানে আমি কোন দিনই যাই নি।

ঘনাদার চারটি গল্প, তেল, ভাষা, মাটি ও মাপ—নিয়ে আমি প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম বই প্রকাশ করলাম 'ঘনাদার জুড়ি নেই।'

ছেলেবেলায় যে তিনজনের লেখা আমাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাঁরা হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি পরিচিত হবার সুযোগ পাইনি— কিন্তু ঘনাদা ও টেনিদার স্রষ্টার সঙ্গে যে এমন গভীরভাবে মেলা-মেশার সুযোগ পাব তা কখনো ভাবিনি।

কল্লোল যুগের শেষ প্রতিনিধি কবি ও সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর আমরা দেখতে পাই নানা ক্ষেত্রে। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস সৃষ্টিতেই শুধু নয়, চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবেও। তবে এ সমস্ত বাদ দিয়েও শুধুমাত্র শিশু ও কিশোর সাহিত্য রচনার জন্যেও তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবেন। নিতান্ত প্রকাশক হিসেবেই আমি তাঁর প্রায় সব রকম ছোটদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম এজন্যে আমি গর্বিতও।

নিতান্ত ছোটবেলায় দেব সাহিত্য কুটীরের একটি পূজা বার্ষিকীতে তার 'দাঁত' গল্পটি পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। সেই বয়সে নানারকম গল্পের বই পড়ার সুযোগ আমার ছিল না। পরবর্তী বয়সে অবশ্য সে দুঃখ আর থাকেনি। অন্য সব রকম বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ মিটিয়ে পড়েছিলাম ঘনাদার সব কটি গল্প। যা এখনো সময় পেলেই পড়ি। এবং বিস্মিত হই, যখন জানতে পারি—কালো, টিমসে, চালিয়াৎ ঘনাদার সব গুলবাজির মধ্যেই বিজ্ঞানের সত্য নিহিত রয়েছে। শুধুই কি বিজ্ঞান, কি নেই ঘনাদার গল্পে! ইতিহাস ও ভূগোলের ডিটেইলড বর্ণনা পড়েও বিস্মিত হতে হয়।

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার প্রথম সংখ্যার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অশোক কুমার সরকার, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বিজ্ঞানী মৃণাল কুমার দাশগুপ্ত।

সেই প্রথম পরিচয় থেকেই একটা নিয়ম প্রায় চালু হয়ে গিয়েছিল। তা হল মাসে অন্তত একবার তাঁর সঙ্গে

ঘনাদা ক্লাবের প্রথম বৈঠকে আলোচনারত
লীলা মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিশোর জ্ঞান
বিজ্ঞান পত্রিকার সংপাদক।

আমার দেখা করতেই হত। কোন কোন মাসে দুবারও হত।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সব থেকে যা আমাকে মুগ্ধ করত তা হল তাঁর বাচন ভঙ্গি। কথা বলার কায়দা। সাধারণত আমি রাত্রের দিকেই যেতাম। সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ। উঠতাম নটা, সাড়ে নটা বা কখনো কখনো দশটা নাগাদ। এমনও দিন গেছে রাত্রে উনি খেতে বসেছেন, আমি গিয়ে হাজির হয়েছি তাঁর খাবার টেবিলের পাশে।

উনি বলতেন, —কে? রবীন—তুমি—তোমার! ব্যস, এই পর্যন্ত বলেই তিনি থামতেন। এই চারটে কথা থেকেই আমাকে সব বুঝতে হত। অর্থাৎ তিনি যা বলতে চাইছেন তাহল :—কে, রবীন, তুমি শেষ পর্যন্ত এলে। তোমার জন্যে আমি সন্ধ্যে থেকে ভাবছি। খবর বল।

যখনই গিয়েছি, তখনই তিনি সদা হাস্যমুখে বসতে বলেছেন। কুশল প্রশ্ন করেছেন। জানিনা আমার সম্পর্কে তিনি হয়তো বাড়ীতেও বলে রাখতেন। কোনও কোনও দিন হয়তো কোনও কারণে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর ছেলেরা হিরণ্ময়বাবু বা মৃন্ময়বাবু তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে দেবার পর আমরা অনেকক্ষণ গল্প করেছি। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে হয়তো জয়ন্তবাবু (জয়ন্ত দত্ত, সহ-সম্পাদক কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান) বা হরিগোপাল বসাক থাকতেন। তিনি সেই একই ভাবে হেসে প্রশ্ন করতেন,—কে রবীন—তোমার সঙ্গে কে? আমি বলতাম, এ আমার বন্ধু হরিগোপাল বসাক।* প্রকাশনা ব্যবসায় রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হরিগোপালের সঙ্গে আলাপে মেতে উঠতেন—তোমরা বসাক? কোথাকার বসাক? এইভাবে আলাপ করতে করতে তিনি একটা যোগাযোগ সূত্র বের করার চেষ্টা করতেন। এবং করেও ফেলতেন।

ব্যবসায়িক কথাবার্তাটুকু মিটিয়ে ফেলে আমরা নানা বিষয়ে আলাপ করতাম। আমি কি কি বই করছি উনি জানতে চাইতেন। এবং অনেক সময় পরামর্শও দিতেন।

কার কাছে একবার শুনেছিলাম—উনি ভাগ্য মানেন। এবং ঠিকুজি কোষ্ঠী বা হাত দেখার ব্যাপারেও ওর আগ্রহ খুব। আমি সোজাসুজি আমার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলাম—প্রেমেনদা, একবার হাতটা দেখে দিন না—কোন বড় পরিবর্তন আছে কিনা। উত্তরে তিনি হাত দেখতে জানেন কি জানেন না বলেন নি। বলেছিলেন, 'দেখ রবীন, ভবিষ্যতে আমার ভাল হবে এটা আগে জেনে আমার ভাল লাগার আনন্দটা কমাতে চাই না। তেমনি খারাপ হবে জেনে আগে থেকে মনটাও খারাপ করার কোন অর্থ নেই।' বস্তুত এই রকম উত্তর পাবার পর 'হাত দেখা' বিষয়টার উপরেই আমার আগ্রহ চলে গিয়েছিল।

* প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'টার্জান অমনিবাস' গ্রন্থের প্রকাশক

ঘনাদার স্রষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্রের (স্বয়ং) সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশের সূত্রে। 1980 সালে পুজোর সময় সমরজিৎ করের সম্পাদনায় বেরয় একটি সংকলন। নতুন-পুরনো বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও প্রবন্ধের একটি সঙ্কলন। তার পরের বছর থেকেই কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ প্রথম সংখ্যার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রথম সংখ্যার প্রথম কপিটি তিনি তুলে দেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক প্রয়াত অশোককুমার সরকারের হাতে। সেই বছরই কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রথম পুজো সংখ্যা বেরোবে। যথারীতি হাজির হলাম প্রেমেন দার বাড়ীতে। অনভিজ্ঞতার জন্য সময় মতো হাজির হইনি। তবুও তিনি নিরাশ করেন নি। প্রথম বছর ঘনাদার পরিচয় সূচক একটা লেখা দিলেন—"ঘনাদাকে আবিষ্কার"। কিন্তু পরের বছর অনেক আগেই তাঁর কাছে হাজির হয়েছিলাম—ঘনাদার গল্পের জন্য। বললাম, প্রেমেন দা, এবারে আপনাকে একটা বড় লেখা দিতে হবে ঘনাদার উপরে। উনি বললেন—দেখ রবীন, ঘনাদার উপরে এখন আমার পক্ষে লেখা খুব মুশকিল। কারণ চোখে এখন কম দেখতে পাই। বিশেষ পড়াশোনা করতে পারি না। আর ঘনাদার গল্প পড়াশোনা না করে লেখা যায় না।

কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। বললাম, কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পুজো সংখ্যায় ঘনাদার গল্প চাই-ই। আবার গেলাম পনেরো দিন বাদে। বললাম—লেখা! বললেন, না রবীন, লেখা তোমায় দিতে পারব না। অন্য রকম কিছু লেখা দেব। কিন্তু আমার সেই গোঁ। ঘনাদার লেখা চাই। শেষে অনেকক্ষণ ভেবে তিনি বললেন—আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার জন্য অন্যরকম ঘনাদার গল্প লিখব। কিন্তু তখনও কি জানি ঘনাদার গল্পের একটা নতুন দিক উন্মোচিত হতে চলেছে। মাস খানেক পরে আবার গেলাম। তখন আর হাতে সময় নেই। বিজ্ঞাপনেও নাম বেরিয়ে গেছে পুজো সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্প থাকবে। আমি তখন অধৈর্য হয়ে উঠেছি। প্রেমেন দা বললেন—শোন, আর্টিস্টকে একটা ছবি করতে দাও। একটা 'খাম' খামের ওপরে লেখা—"ঘনাদাদু, 72 বনমালী লেন"। তখনও মূল গল্পের মাথামুণ্ডু জানি না। প্রেমেন দা বললেন, দেখো বেশী পড়াশোনা করতে হবে না অথচ ঘনাদার গল্প এবং তাতে মজাও থাকবে, বিজ্ঞানও থাকবে আবার ইতিহাসও থাকবে। গল্পটা এই রকম। একটি সংস্থার নাম মৌ-কা-সা-বি-স। অর্থাৎ 'মৌলিক কাহিনী সার বিপনন সংস্থা'। এরাই ঘনাদাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে যে ঘনাদার গল্পের স্টক আর নেই। তাই কম দামে এই সংস্থা ঘনাদাকে গল্পের প্লট সাপ্লাই করতে চায়। ঘনাদা ও মৌ-কা-সা-বি-স সিরিজের প্রথম গল্প বের হল—কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পাতায়—'ঘনাদা ও মৌ-কা-সা-বি-স এর চিঠিপত্র'। এরপর প্রতি বছরই প্রেমেনদা কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পুজো সংখ্যায় ঘনাদা ও মৌ-কা-সা-বি-সের গল্প লিখেছেন। রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। প্রতিবারই মৌ-কা-সা-বি-স এর ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ—ঘনাদা হেলায় দুমড়ে মুচড়ে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। শিবু, শিশির, গৌর ও সুধীরের মতো আমরাও গভীরভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ি কে এই মৌ-কা-সা-বি-স? মৌ-কা-সা-বি-স একজন না অনেকে? ধৈর্য রাখতে না পেরে ঘনাদা ক্লাবের প্রথম বৈঠকে তাঁকেই প্রশ্নই করে ফেললাম—প্রেমেনদা, কে এই মৌ-কা-সা-বি-স? অনুরোধ করলাম আপনি অন্ততঃ পরের বারের পুজো সংখ্যার পাতায় এর রহস্যটা জানিয়ে দেবেন। সভা পরিচালিকা লীলা মজুমদার বললেন, কে আবার? মৌ-কা-সা-বি-স ঘনাদা স্বয়ং।

সেই রহস্য কিন্তু তিনি ভেঙে দিয়ে গেছেন গতবারের পুজো সংখ্যায়—'ঘনাদা বনাম মৌ-কা-সা-বি-স গল্পে'। এবং এটিই ঘনাদার শেষ গল্প।

মৃত্যুর কিছু দিন আগে আমি যখন তার কাছে যাই—তখন তিনি বিছানায় শয্যাশায়ী। আমার দাদা ও বন্ধু অশোক দাস পাশের ঘরে বসে। কথাবার্তা বলছেন কম। বড় ছেলে মৃন্ময় বাবু বললেন, আপনি এসেছেন? আপনার

জন্য বাবা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। আপনি কিন্তু বাবার সঙ্গে দেখা করে যাবেনই। সেদিন আমরা অনেকক্ষণ কথা বলেছি। নানা রকম কথা বলার পর হঠাৎ ই তিনি বললেন, মনে পড়ে রবীন, তোমার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ—একটু থেমে বললেন, ঢাকায় তোমাদের বাড়ী ছিল কাগজীটোলায়, আমি থাকতাম টিকাটুলিতে। ঢাকায় না গেলে আমার সায়েন্স পড়াও হত না, হয়তো সায়েন্স ফিকশনও লিখতাম না। অনেকক্ষণ ধরে কথা বলার ক্লান্তিতে সেদিন তিনি আর কথা বলতে পারলেন না – ঘুমিয়ে পড়লেন।

আশ্চর্য স্মরণ শক্তি ছিল প্রেমেনদার। প্রায় দু যুগ আগে প্রথম পরিচয়ের আলাপ যা আমি নিজেই ভুলে গিয়েছিলাম—সেটা তিনি আবার মনে করিয়ে দিলেন কেন? শুরুর সঙ্গেই তিনি কি শেষটাও দেখতে পেয়েছিলেন? বহুবার প্রশ্ন করেও মো-কা-সা-বি-সের রহস্যের হদিশ যাঁর কাছে জানতে পারিনি, তা তিনি নিজের ইচ্ছেতেই কেন ভেঙে দিয়ে গেলেন গতবারের পুজো সংখ্যায়?

ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে সেই টিকাটুলিও আছে। আছে তার পাশে কাগজীটোলাও। নেই প্রেমেন্দ্র মিত্র। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আমার বিশ্বাস বাংলা ভাষার হরফের সঙ্গে বেঁচে থাকবে ঘনাদার গল্পগুলি—বেঁচে থাকবেন ঘনাদার স্রষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্রও।

[redacted]

[22 পৃষ্ঠার পর]

লেখক সাংবাদিকরা কি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ?

উপহাসের হাস্য যদি আসে ঠোঁটের কোণে, এখুনি তা মিলিয়ে যাবে।

স্যাভিনিয়েন সিরানো ডি বারজেরাক—সুবিখ্যাত এই ফরাসী সাহিত্যিকের নাম জানেন না, তামাম দুনিয়ায় এমন সাহিত্যরসিক মানুষ নেই।

ইনি অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেন তার বহুগুণের জন্য। এডমণ্ড রোস্টাণ্ড এঁকে নিয়ে নাটক রচনা করেছিলেন দুটি কারণেঃ প্রথম, সিরানো ডি বারজেরাক মস্তবড় নাসিকার অধিকারী ছিলেন; দ্বিতীয়, তরবারি চালনায় অসাধারণ দক্ষ ছিলেন অসামান্য এই লেখনীচালক।

পৃথিবীর মানুষ কিন্তু সিরানো ডি বারজেরাককে মনে রেখে দেবে তাঁর অত্যাশ্চর্য কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর জন্যে, সুনিপুণ নাট্যরচনার জন্যে, বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যের জন্যে, এবং সম্ভবতঃ, ভবিষ্যতের কথা বলে যাওয়ার জন্যে।

সিরানো ডি কারজেরাক যখন স্বর্গে গেলেন, তার পরে তাঁর দুখানা বই প্রকাশিত হল 1656 আর 1662 সালে। একটা চাঁদে অভিযান সম্পর্কে, আর একটা সূর্যাভিযান সম্পর্কে। দুটো বই-ই সাধারণতঃ ইংরেজীতে এক খণ্ডে বেরোয়। বইটার নাম 'ভয়েজেস টু দ্য মুন অ্যাণ্ড দ্য সান'।

রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীদের অনুসন্ধান করে দমন করবার জন্যে স্থাপিত বিচারালয়ের সামনে গ্যালিলিও যখন পূর্বমত প্রত্যাহার করে নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন, তার মাত্র বছর কয়েক পরেই এই বই দুটিতে সিরানো বর্ণনা দিয়েছেন কিভাবে সূর্যকে ঘিরে পৃথিবী ঘুরছে নিজের কক্ষ পথে—একই ভাবে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে অন্য গ্রহেরাও। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ বড় দুর্বল—একথাও বই দুটিতে বলে গেছেন সিরানো। সেই সঙ্গে এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে অভিযানের সাত রকম পন্থার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। কল্পনারঙিন এই আন্তঃগ্রহ ভ্রমণের সপ্ত উপায়ের একটি হচ্ছে রকেট-তাড়িত অভিযান!

এ যুগের দুধের বাচ্ছারাও বোধ হয় জানে, রকেটের শক্তিতে গ্রহ-গ্রহান্তরের আইডিয়া কবে কার মাথায় প্রথম এসেছিল। কিন্তু সিরানো ষোড়শ শতাব্দীতে সেই ভবিষ্যৎ-বাণী করলেন কোন মন্ত্রগুপ্তির দৌলতে? কল্প বিজ্ঞান কাহিনী যারা লেখেন, তাঁরা কি ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পান?

সিরানোর কীর্তিকলাপের আরও কিছু শোনা যাক।

এই পৃথিবীর নানা দেশের পুরাণ কাহিনীতে দেবতা-অধিদেবতাদের যে আষাঢ়ে (!) গল্প আছে, আদতে তা পৃথিবীরই ইতিহাস—রূপকের মাধ্যমে তা বলা হয়েছে।

অদৃশ্য কণ্ঠের হুঁশিয়ারিতে ফটোতে দেখা যাচ্ছে চার্চিল নেমে আসছেন তার গাড়ি থেকে।

এই দেবতা গোষ্ঠী পৃথিবীর মানুষ নয়, এসেছে পৃথিবীর বাইরে থেকে। অর্থাৎ ভিনগ্রহী পর্যটক—পৃথিবী তাদের ভাল লেগেছিল, অনেক আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা করে গেছিল—আজও সেগুলো সভ্য মানুষদের চোখ ছানাবড়া করে ছাড়ছে।

পিলে চমকানো এই আইডিয়ার প্রথম (!) প্রবক্তা এরিখ ফন দানিকেন। সারা পৃথিবী তিনি টহল দিয়েছেন তাঁর এই বিশ্বাসের কথা বলতে (প্রমাণ সহ); কলকাতাতেও এসেছিলেন এবং প্রেস ক্লাবে এই নিবন্ধের লেখকের প্রশ্নের সম্মুখীনও হয়েছিলেন।

কিন্তু আদৌ কি তিনি প্রথম প্রবক্তা? নাকি, অভিনব আইডিয়াটা কর্জ করেছিলেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা সিরানোর কাছ থেকে? দানিকেনের তিনশ বছর আগে সিরানো যে বলে গেছেন—দেবতা আর পুরাণে বর্ণিত মহাবীররা আসলে চাঁদের অধিবাসী (মূলতঃ এসেছে তারা সূর্য থেকে)। ইচ্ছে মত নিজেদের আকার বদলাতেও পারত প্রাগৈতিহাসিক কালের এই চন্দ্র মানবরা!

চাঁদের প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে সিরানো যা লিখে গেছেন, তা আরও বিস্ময়কর। (1) কনকনে ঠাণ্ডায় বাড়ি ঢুকিয়ে নেওয়া যাবে ভূগর্ভে; এই বাড়ি তৈরি হবে প্রকাণ্ড ইস্ক্রুপের ওপর। আজ পর্যন্ত অবশ্য খনি-খাদ অঞ্চলের বাড়ি নির্মাতারা ওঠানো-নামানো-যায়, এমন ইস্কুপের ওপর বাড়ি তৈরির চেষ্টা করেন নি)।

(2) ঋতু পরিবর্তন অনুসারে বাড়ি স্থান পরিবর্তন করবে; হাপর দিয়ে পাল ফুলিয়ে বাড়িদের সরিয়ে নেওয়া যাবে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়।

(3) বক্তৃতা রেকর্ড করা যাবে এবং প্লে-ব্যাক করা যাবে।

(4) দ্যুতিময় বাল্বের সাহায্যে চান্দ্র-রজনীকে দিনের মত ঝলমলে করে তোলা যাবে।

সায়েন্স-ফিকশন লিখিয়েরা অনেক রকমের প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন ঠিকই, কিন্তু সিরানো যত আগে কল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্র মাৎ করে গেছেন—অতটা আগে কাউকেই চমক দিতে দেখা যায় নি। ওঁর দূরদৃষ্টির আরও একটা নমুনা শুনলেই বোঝা যাবে ভদ্রলোক সত্যিই ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন কিনা। ফোনোগ্রাফ আর টেপরেকর্ডারের নাম আজ কে না জানে, কিন্তু এই জাতীয় ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক আবিষ্কারের ভাবী সম্ভাবনার কথা বলে গেছিলেন সিরানো ডি বারজেরাক নামে এক লেখক বহু-বহু বছর আগে!

এমনি কলমবাজ প্রতিভাধর যুগে যুগে চমক সৃষ্টি করে গেছেন তাঁদের তৃতীয় নয়নের ক্ষমতা দেখিয়ে। যেমন, এডগার অ্যালান্ পো। 1838 সালে লিখেছিলেন লোমহর্ষক কাহিনী দ্য ন্যারেটিভ অফ আর্থার গর্ডন পিম অফ নানটাকেট' জাহাজডুবির পর প্রাণে বেঁচে গেছিল মাত্র তিন জন। কিন্তু ক্ষিধে আর তেষ্টা সহ্য করতে না পেরে এরা লটারী করে ঠিক করেছিল তিন জনের একজনকে মেরে খেতে হবে। লটারীতে হেরেছিল রিচার্ড পার্কার। তারপর...!

1884 সালে জাহাজ ডুবির পর তিনজন জীবিতর বিচার হয়েছিল চতুর্থ ব্যক্তিকে খুন করে খেয়ে ফেলার অপরাধে। ক্ষিধের জ্বালায় যাকে আহার করেছিল এই ভাবে, তার নাম রিচার্ড পার্কার—একজন কেবিন বয়।

ফরাসী সাহিত্যিক জুলভের্ন, ইংরেজ জার্নালিস্ট উইলিয়াম, আমেরিকান সাহিতিক মার্কটোয়েন, ইংরেজ ঔপন্যাসিক জে বি প্রীস্টলি, আমেরিকান জার্নালিস্ট পি লাইন (জুনিয়র) এবং আরও অনেক বুদ্ধিজীবীর চাঞ্চল্যকর কাহিনী বড় বড় রথী-মহারথীর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। স্থানাভাবে এঁদের সব কথা লেখা যাচ্ছে না।

তবে 'ব্ল্যাক অ্যাবডাকটর' উপন্যাসটার নাম করা যেতে পারে। জেমস রাস্ক ছদ্মনাম (হ্যারিসন জেমস) নিয়ে লিখেছিলেন এই অপরাধ কাহিনী (1972) ঠিক দু বছর পরে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সন্দেহ করে বসল লেখককে। উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাই যে ঘটে গেছে বাস্তবে!

1912 সালে 'টাইটানিক' জাহাজ ডুবে যায়—অথচ এ জাহাজ নাকি ডোববার নয়। কিন্তু কী আশ্চর্য! 1898 সালে মরগ্যান রবার্টসন 'দ্য রেক অফ দ্য টাইটান' নামে একটা উপন্যাস লেখেন। 'টাইটান' নামক জাহাজের সঙ্গে অদ্ভুত মিল ছিল দেখা গেছিল 'টাইটানিক' জাহাজের। দুটো জাহাজই ডুবেছিল এপ্রিল মাসে এবং একই ভাবে—ভাসমান বরফের বিরাট স্তূপে ধাক্কা লেগে!

চার্চিলও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা?

ডাকাবুকো প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল হিটলারের বোমাকে তোয়াক্কা করতেন না। বোমা যখন পড়ছে আকাশ থেকে, তখনও ঘুরে ঘুরে দেখতেন সৈন্য-সামন্তরা ঠিকমত লড়াই করছে কিনা।

একদিন ঠিক এইভাবে গোলন্দাজদের গোলা বর্ষণ পরীক্ষা করে ফিরে এসে নিজের গাড়িতে উঠেও নেমে পড়লেন চার্চিল। রোজকার অভ্যেস মত গাড়িতে যেখানে বসতেন, সে জায়গা তাঁর পছন্দ হল না। গাড়িকে চক্কর মেরে গিয়ে উঠলেন অন্য দিকের আসনে। মিনিট কয়েক পরেই বোমা পড়ল কাছেই এবং গাড়ি প্রায় উল্টে গিয়ে বিপজ্জনকভাবে ধেয়ে গেল মাত্র দু-চাকার ওপর ভর করে একদিকে কাৎ হয়ে—যেদিকে বসতে গিয়েও বসেননি চার্চিল।

পরে এই প্রসঙ্গে মস্করা করে বলেছিলেন উনি "যা চর্বি আমার গায়ে, ভাগ্যিস উল্টো দিকে বসেছিলাম, তাই উল্টোতে গিয়েও সিধে হয়ে গেল চলন্ত গাড়ি। নিজের স্ত্রীকে কিন্তু বলেছিলেন—"কে যেন বলে উঠল, থামো! তাই এ দরজা দিয়ে না উঠে ও দরজা দিয়ে গাড়িতে উঠেছিলাম।"

বোমা যে পড়বে, তা আগেভাগেই যেন জানতে পারতেন চার্চিল। একদিন বাড়িতে বসে মন্ত্রীদের নিয়ে মিটিং করছেন—বাইরে কিন্তু বোমা পড়ছে আকাশ থেকে, মিটিং এবং আহার—দুটোই নির্বিকারভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন চার্চিল। হঠাৎ উঠে গিয়ে ঢুকলেন রান্নাঘরে। যারা কাজ করছিল, তাদের হুকুম দিলেন বম্ব-শেলটারে যেতে—অবিলম্বে!

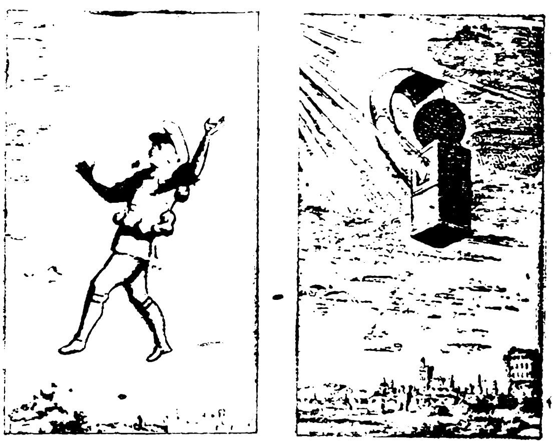

প্রথম ছবিতে ভাসছে একজন মানুষ, বিশেষ ধরনের কোমরবন্ধনী পরে।

বলেই ফিরে এলেন অভ্যাগতদের কাছে। ঠিক তিন মিনিট পরে বোমা পড়ল রান্নাঘরে! একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল সবকিছু!

কিন্তু গায়ে আচড়টি লাগল না চার্চিলের এবং তার লোক-জনের।

ভবিষ্যৎ কথনের এবং ভবিষ্যৎ দর্শনের এমনি রোমাঞ্চকর কাহিনী এত আছে যে একটা মোটা বই তাতে ভরে যাবে। কিন্তু জিজ্ঞাসু পাঠক পাঠিকার মনের জিজ্ঞাসা কি তাতে মিটবে?

কেন এমন হয়? কিভাবে ভবিষ্যতের ব্যাপার টের পাওয়া যায়? কোন পদ্ধতিতে সুবিখ্যাত জ্যোতিষী 'কিরো' কুচক্রী সন্ন্যাসী রাসপুটিনের শোচনীয় পরিণতি বলে গেছিলেন ঘটনার এগারো বছর আগে এবং দশ বছর আগেই বলেছিলেন রাজা অষ্টম এডোয়ার্ড রাজসিংহাসন ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন?

রহস্যময় 'সময়'

মহাকাল অন্ত প্রহেলিকা বুকে নিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ জুড়ে। কাল অর্থাৎ সময়ের হেঁয়ালি বুঝেছে ক'জন?

হয়ত সময় রহস্যের অন্দরে প্রবেশ করতে পারেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টারা। হয়ত তাঁরা জানেন, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সহাবস্থান করছে একই সাথে—একটির পর একটি আসছে, এ ধারণা ভুল। অতীত গেলে বর্তমান, বর্তমান গেলে ভবিষ্যৎ—এ তত্ত্ব সরল রেখায় চলার তত্ত্ব—। সীমিত জ্ঞানের অধিকারীদের তত্ত্ব। আসলে—'ত্রিকাল মিশে রয়েছে একই সাথে। যাঁরা ত্রিকালদর্শী'—তাঁরা অতীত এবং ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন বর্তমানে পা রেখেই।

বিষয়টা আরও একটু প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করা যাক। যে কোন পার্থিব বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ—এই তিনটে 'মাত্রা' আছে। ঠিক তেমনি, সময়েরও অনেক 'মাত্রা' আছে। একটা 'মাত্রার নাম আমরা সবাই জানি স্থায়িত্ব। আবার কোন জিনিস হঠাৎ আবির্ভূত হচ্ছে। হঠাৎ উধাও হয়ে যাচ্ছে। 'সময়ের না-জানা 'মাত্রা'দের (Dimension) জন্যেই এমনি হচ্ছে।

এমনি একটা অজ্ঞাত সময়-মাত্রার (Time-Dimension) নাম ভবিষ্যৎ বাণী।

ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করার জ্ঞান

ভবিষ্যৎ দর্শনের ব্যাখ্যা করার আগে ভবিষ্যৎ কাকে বলে – তা নিয়ে যৎসামান্য চিন্তাভাবনা করে ফেলা যাক।

যা ঘটার, তাই তো ভবিষ্যৎ। সুতরাং বর্তমানে তার রেশ থাকবে কেন? ভবিষ্যৎ তো ঘটেই নি!

উত্তম যুক্তি। তার্কিকরা কিন্তু বললেন, ভবিষ্যৎ তো বর্তমানের লাগোয়া – সুতরাং বর্তমানে ভবিষ্যতের আভাস থাকবেই। বীজ দেখে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা বলেন কিভাবে, কি গাছ হবে? কি ফুল ফুটবে?

নিজের জীবনে ভবিষ্যতের অশনি সংকেত না হয় স্বপ্ন বা অশুভ লক্ষণের মাধ্যমে ধরা যায়—কিন্তু ছমাস পরে, বা কয়েকশ বছর পরে হাজার, হাজার মাইল দূরে যা ঘটবে, তার নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া হয় কিভাবে?

এর জবাবে যে জটিল তত্ত্ব সমূহের অবতারণা ঘটিয়েছেন পাশ্চাত্যের তিন-তিনজন দার্শনিক এবং গণিতবিদ, তার ভেতরে প্রবেশ করলে এই নিবন্ধ দুষ্পাচ্য হয়ে যেতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায়, এঁরা তিনজনেই বিশ্বাস করেন সব ঘটনাই কালহীন মানসিক ছকে বাধা রয়েছে—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অজীব এবং সজীব যাবতীয় বস্তুই তার সঙ্গে সম্পর্কিত।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ এবং গণিতবিদ অ্যাড্রিয়ান ডব্‌স্‌ 1965 সালে যে অনুমিতির কথা বলেন, তা এই ঃ

সাব-অ্যাটমিক লেভেলে বিধৃত ঘটনাসমূহর "তরঙ্গ' বিশেষ ভাবে সেনসিটিভ কতিপয় ব্যক্তির ব্রেনের নিউরোন কোষে সাড়া জাগাতে পারে। এই তরঙ্গকে বলা যায় Psitronic Wavefront এবং Neuronal apparatus সমন্বিত যে ব্যক্তি এই Wavefront এর তর্জমা ঠিক ধরতে পারেন, তিনিই ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা।

আগামী সংখ্যায়
আবির্ভাব ও অন্তর্ধান রহস্য

কিশোর ক্লাসিকস

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অপুর ছেলেবেলা ১০৲

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের কাজল ১২৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের অপরাজিত ১০৲

খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শেক্সপীয়ারের গল্প ১০৲

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তেপান্তর ২৫৲

জগদীশচন্দ্র বসু
অব্যক্ত ১০৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্দীপন পাঠশালা ১০৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
টেনিদার অভিযান ২৫৲

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
রোমাঞ্চকর ২৫৲

প্রেমেন্দ্র মিত্র
ঘনাদা বিচিত্রা ২৫৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কিশোর অপু ২৫৲

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বাঙলার ডাকাত (অখণ্ড) ২৫৲

ছড়া ও কবিতা

কেনেথ আণ্ডার সন
শিবানীপল্লীর কালোচিতা ২০৲
মানুষ খেকোর বিভীষিকা ১৫৲

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
খুকুমণির ছড়া ১০৲

অন্নদাশঙ্কর রায়
বিন্নিধানের খই ১০৲
হট্টমালার দেশে ১০৲

কিশোর রচনাবলী

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী ৩০৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
কিশোর রচনা সমগ্র ৩০৲

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত
শার্লক হোমস্-এর কিশোর সমগ্র ৩০৲

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
কিশোর রচনা সমগ্র ২৫৲

মেঘনাদ সাহা
কিশোর রচনা সঙ্কলন ১২৲

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
কিশোর রচনা সঙ্কলন ১৫৲

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
কিশোর রচনা সঙ্কলন ১৫৲

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
কিশোর গল্প সমগ্র ৩০৲

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

লীলা মজুমদার
কল্প বিজ্ঞানের গল্প ১৫৲

অদ্রীশ বর্ধন
কিশোর সায়েন্স ফিকশন ১৫৲

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
তুষারলোকের রহস্য ৮৲

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
মেঘনাদ ১০৲

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
লুপ্তধন ৮৲

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
নীল মানুষের কাহিনী ১০৲

শিশিরকুমার মজুমদার
নাখনাটিয়ার রহস্য

জনপ্রিয় বিজ্ঞান

সমরজিৎ কর
পরমাণু গবেষণায় ভারত ১০৲
মহাকাশ গবেষণায় ভারত ১৫৲

বিমান বসু
গ্রহ পরিচয় ১০৲
নক্ষত্র পরিচয় ১০৲

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বাংলার গাছপালা ১০৲
পশুপাখী কীটপতঙ্গ ১০৲
বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার ৮৲

সাধন দাশগুপ্ত
আলো আরও আলো ১৫৲
রোমাঞ্চকর রসায়ণ ১২৲

পার্থসারথি চক্রবর্তী
মাটি থেকে আকাশে ১০৲

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পৃথিবীর পরিচয় ১০৲

সুধাংশু পাত্র
বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ ১০৲

জয়ন্ত বসু
পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময় ১৫৲

এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়
বিচিত্র বিজ্ঞান ৮৲

জ্ঞানবিজ্ঞানের কোষগ্রন্থ

সমরজিৎ কর সম্পাদিত
স্টুডেন্টস বুক অব নলেজ ৫০৲

অমরনাথ রায় সঙ্কলিত
স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া ২৫৲

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ : 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-9

ইলেকট্রনিক্স ক্যুইজ Part-V বিপ্লব ব্যানার্জী

প্রশ্ন সংখ্যা—12 সময়—10 মিনিট

1. কোন একটি 12 volt ব্যাটারীর Short Circuit Current 60 Amp হলে, উক্ত ব্যাটারীর Internal Resistance হবে,—(a) 2 Ohm, (b) 5 Ohm (c) O·5 Ohm, (d) O·2 Ohm, (e) Zero Ohm.

2. RMA Colour Code বলতে কি বুঝ ?

3. Electronics এর জগতে বিশ্বব্যাপী অনুমোদিত একটি ইংরাজী Sentence আছে যা হল,—

"B B. Roy of Great Bretain has a Very Good Wife." এই Sentenceটির তাৎপর্য কি ?

4. দুইটি ধাতব পাতের মাঝে একটি প্রায় অন্তরক পদার্থ সংস্থাপন করে যে বস্তুটি উৎপন্ন হয় তাকে বলে,—(a) Inductor, (b) Resistor, (c) Capacitor, (d) Transformer.

5. If Electronics is well related with Philosophy, then from Philosophical point of view as derived from my personal imagination, the following Statement, "Husband is nothing but the Dielectric Substance of a Nonelectrolytic capacitor of which one plate of the capacitor consists of the Husband's Family Members and the other plate consists of the Wife and her family Members."—

(a) আংশিক সত্য (b) সম্পূর্ণ সত্য (c) সম্পূর্ণ ভুল (d) চিন্তা করার বিষয়

6. কোন রোধকের Tollerance বলতে কি বোঝ ?

7. কোন রোধকের গাত্রবর্ণের বিভিন্ন রঙের shade দেখে কি ভাবে রোধকের মান নির্ণয় করা হয় ?

8. একটি রোধকের প্রথম রং yellow, দ্বিতীয় রং violet এবং তৃতীয় রং Green হলে ঐ রোধকের মান কত ? উক্ত রোধকের গাত্রে চতুর্থ কোন রঙের প্রলেপ না থাকলে ঐ রোধকের Tollerance কত হবে ?

9. কোন রোধকের চতুর্থ রং সোনালী অর্থাৎ Golden হলে উক্ত রোধকের Tollerance হবে,—(a) 1%, (b) 5%, (c) 15%, (d) 8%, (e) 10%।

10. কোন রোধকের চতুর্থ রং রূপালী অর্থাৎ Silvery হলে উক্ত রোধকের Tollerance হবে, (a) 0·1%, (b) 8·33%, (c) 10%, (d) 2%, (e) 12%।

11. এই রোধকের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রং যথাক্রমে Brown, Black এবং Green আর উক্ত রোধকের প্রান্তদ্বয়ের বিভব প্রভেদ 180 volts হলে, রোধকটির ব্যবহৃত ক্ষমতা বা Power হবে,—(a) 1·8 watts, (b) 18 watts, (c) 32·4 mili watts, (d) 3 24 watts (e) 180 milli watts.

12. কোন একটা Power Amplifier এর Power Gain 30db এবং Input Power এক মিলিওয়াট হলে Amplifier যে পরিমাণ Output Power দিতে পারবে তা হল,—

(a) 1 watt, (b) 30 watts, (c) 30 mili watt, (d) 3 watts, (e) 10 watts, (e) 300 watts.

ইলেকট্রনিক্স ক্যুইজ Part V-এর উত্তর

1. (d), 2. RMA অর্থাৎ Radio Manufacturers' Association একটি Colour Code পদ্ধতি আবিষ্কার করে যা দেখে কোন Ressistor বা Capacitor এর মান বলে দেওয়া যায়।

3. বিভিন্ন রোধকের গাত্রে বিভিন্ন রঙে রং করা থাকে যা থেকে কোন রোধক বা Resistor এর মান নির্ণয় করা যায়। এখানে B = Black = 0, B = Brown = 1,

Great = Green = 5, ———→ Yellow = 4
Bretain = Blue = 6 ↓
Very = Violet = 7, ROY
Good = Gray = 8, ↑ ↑
Wife = White = 9 ———→ Orange = 3
———→ Red = 2

4. (c), 5. (d), 6. রোধকের Tollerance হল শতকরা এমন একটি মান যে মান রোধকের একটি নির্দিষ্ট মান অপেক্ষা কম বা বেশী হলে রোধক তা সহ্য করার ক্ষমতা রাখে।

7. সাধারণতঃ রোধকের প্রথম তিনটি Colour shade থেকে রোধকের মান নির্ণয় করতে হয়। কোন রোধকের মান হবে,—

প্রথম Colour এর মান এর পর দ্বিতীয় Colour এর মান বসিয়ে এবং দ্বিতীয় Colour এর মান বসাবার পর তৃতীয় Colour এর মান অনুযায়ী ঠিক তত সংখ্যক শূন্য বসাবার পর যে সম্মিলন মান হবে তা। ধর একটি রোধকের প্রথম তিনটি Colour যথাক্রমে Brown, Green এবং Orange হলে উক্ত রোধকের মান হবে = 15000 Ohm = 15 kilo Ohm, সেখানে Brown = 1, Green = 5, Orange = 3 = 3টি শূন্য বসিয়ে।

8. 4·7 Mega Ohm আর Tollerance = 20%

9. (b), 10. (c), 11. (c), 12. (a).

17নং যাদব ঘোষ রোড, সরশুনা, কলকাতা-61

কম্পিউটার কি করে কাজ করে ?

সমস্ত কম্পিউটারের ভিতরেই মূলত তিন রকম কাজ করার যন্ত্রপাতি বসানো থাকে। নামেই যন্ত্রপাতি আসলে এগুলি সবই ইলেকট্রনিক আই. সির সাহায্যে তৈরি, সার্কিট, কোনো নড়াচড়া করার মতো কলকজা তাতে থাকে না। এই তিনটি অংশ হলো সেণ্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (Central Processing Unit) বা সংক্ষেপে সি. পি.ইউ (C. P. U.), ইলেকট্রনিক মেমরি বা প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইস (Primary Storage Device) এবং ইনপুট আউটপুট ডিভাইস (Input/Output Device) বা সংক্ষেপে আই/ও ডিভাইস (I/O Davice)। এদের মধ্যে সি পি. ইউই হলো কম্পিউটারের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কেউ কেউ C. P. U কে কম্পিউটারের মস্তিষ্কের সঙ্গেও তুলনা করে থাকেন। তবে আমাদের মস্তিষ্ক নিজে নিজে চিন্তা করতে পারে। কিন্তু C. P. U.-এর নিজে চিন্তা করার কোনো ক্ষমতাই নেই। খুব সহজ করে বললে বলতে হয় C. P. U হলো এমন একটি জটিল ইলেকট্রনিক সার্কিট যার অনেক রকম কাজ করার ক্ষমতা থাকে। যেমন একটি C. P. U দুটি সংখ্যা যোগ করতে পারে, বিয়োগ করতে পারে। কোনো তথ্য বা সংখ্যাকে কম্পিউটারের এক অংশ থেকে অন্য অংশে চালান করতে পারে ইত্যাদি। ঠিক যেমন একটি টেপরেকর্ডারের অনেক কিছু করার ক্ষমতা থাকে, গান বাজানো, রেকর্ড করা, ফাস্ট ফরোয়ার্ড কিম্বা রিওয়াইণ্ড করা ইত্যাদি। কিন্তু টেপরেকর্ডারটি কখনোই নিজে নিজে তার মধ্যে আমাদের পছন্দসই ক্যাসেট ভরে গান বাজিয়ে দিতে পারে না। এর জন্য আমাদেরই ক্যাসেট ভরে প্লে বোতাম টিপতে হয়। ঠিক তেমনি C. P. U-এর অনেক রকম কাজ করার ক্ষমতা থাকলেও সেই কাজগুলি আমাদেরই তাকে নির্দেশ পাঠিয়ে করিয়ে নিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে একটি 8 bit* C. P. U. প্রায় দুশো ছাপান্ন রকম কাজ করতে পারে। এই এতো রকম কাজের মধ্যে থেকে কোনো একটা কাজ বেছে নিতে হলে আমাদের C. P. U.-তে একটি বিশেষ বিদ্যুৎ সংকেত পাঠাতে হয়। প্রতিটা কাজ বেছে নেওয়ার জন্য আলাদা আলাদা রকম বিদ্যুৎ সংকেত বরাদ্দ করা থাকে। কম্পিউটার পরিভাষায় একে বলা হয় ইন্সট্রাকশন সেট্ (Instruction Set)। প্রতিটি ইন্সট্রাকশন সেটের জন্য এক এক রকম বিদ্যুৎ সংকেতের ব্যবস্থা করার কথা বললেই যে কায়দাটা প্রথমেই আমাদের মাথায় আসে তা হল প্রতি ইন্সট্রাকশন সেটের জন্য এক এক রকম ভোল্টেজ ব্যবহার করা। অর্থাৎ যদি C. P. U-র দুশো ছাপান্ন রকম ইন্সট্রাকশন সেটের মধ্যে প্রথমটি বেছে নিতে হয় তবে C. P. U তে এক ভোল্ট পাঠানো। যদি দশ নম্বরটি বেছে নিতে হয় তবে দশ ভোল্ট পাঠানো এই রকম আর কি। তবে এতো সহজ সমাধানটি কিন্তু কম্পিউটারে মোটেই ব্যবহার করা হয় না। সেখানে ব্যবহার করা হয় ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং বাইনারি নাম্বার (Digital technology, Binary number), এ দুটি বিষয়ে আগামী সংখ্যায় অনেক কিছু আমরা জানতে পাবো। কিন্তু তার আগে একবার চট্ করে কম্পিউটারের কলাকৌশলটি বুঝে নেওয়া যাক।

একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই এতোক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে কম্পিউটারে মস্তিষ্ক স্বরূপ C. P. U-র যদিও অনেক রকম কাজ করার ক্ষমতা থাকে, তবু সে নিজে নিজে কিছুই করতে পারে না। আমাদেরই C.P.U তে বিশেষ সংকেত পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় কাজগুলি করিয়ে নিতে হয়, ঠিক যেমন ক্যালকুলেটরের বোতাম টিপে টিপে আমাদের ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে অঙ্ক কষে নিতে হয়। তবে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সুবিধা আছে। C. P. Uকে দিয়ে পর পর কি কাজ করতে হবে তার নির্দেশগুলি আমরা কম্পিউটারের অপর মূল অংশ ইলেকট্রিক মেমরি বা স্মৃতি ভাণ্ডারে রেকর্ড করে রাখতে পারি। ফলে যখনই কোনো কাজ করার দরকার পড়ে, তখন আর আমাদের বারে বারে C. P. Uতে নির্দেশ পাঠাতে হয় না। C. P. U নিজে নিজেই ওই মেমরিতে রেকর্ড করা নির্দেশগুলি পর পর পড়ে নিয়ে কাজটি করে ফেলে। কম্পিউটার প্রযুক্তিতে C. P. Uকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার নির্দেশকে বলা হয় প্রোগ্রাম (Programme) আর যাঁরা এই প্রোগ্রাম লেখেন, তাঁদের বলা হয় প্রোগ্রামার (Programmer)।

এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে এই প্রোগ্রামটি প্রোগ্রামার কম্পিউটারের মেমরিতে ঢোকাবেন ? এর জন্য রয়েছে

* 8 bit কাকে বলে তা ভবিষ্যতে আলোচনা করা হবে।

কম্পিউটারের তিন নম্বর অংশ I/O Device। এর সাহায্যে প্রোগ্রামার ও C. P. U পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। দুটি I/O Device এর সঙ্গে আমাদের ইতিপূর্বেই পরিচয় হয়েছে। প্রথমটি হলো কী বোর্ড (Key board) এবং দ্বিতীয়টি হলো মনিটর বা ভি. ডি. ইউ (Monitor, V. D. U) এদুটি সংযুক্তি ছাড়া আরো নানা রকম I/O Device পাওয়া যায় যেমন প্রিণ্টার (Printer), প্লটার (Plotter), ডিজিটাইজার (Digitiger), স্ক্যানার (Scanner) ইত্যাদি। এদের কম্পিউটার পরিভাষায় অনেক সময় পেরিফেরলস্ (Peripherals) ও বলা হয়ে থাকে।

কম্পিউটার প্রোগ্রামার তাঁর প্রোগ্রাম কী বোর্ডে টাইপ করেন। C. P. U সেই প্রোগ্রামগুলিকে পর পর ইলেকট্রনিক মেমরিতে সাজিয়ে রাখে। তারপর প্রোগ্রামারের কাছ থেকে সংকেত পেলেই মেমরিতে রেকর্ড করা নির্দেশগুলো পর পর পালন করে একটা জটিল কাজ নিমেষের মধ্যে করে ফেলে।

সুতরাং একটি আধুনিক কম্পিউটারের যদি ব্লক ডায়াগ্রাম

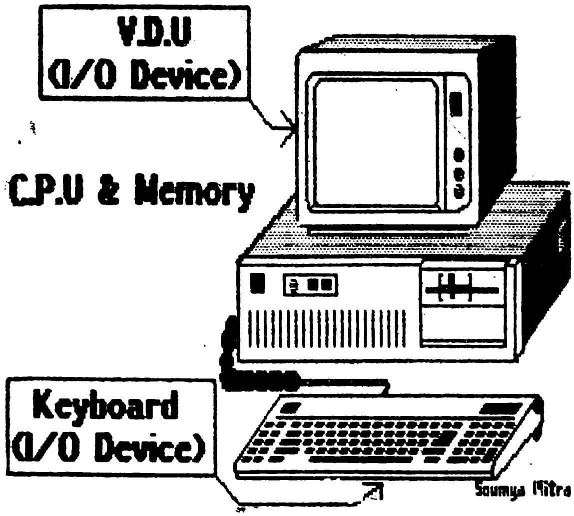

চিত্র—1

(Block diagram) আঁকা যায় তবে তাতে থাকবে তিনটি ব্লক (চিত্র 1)। একটি হলো I/O Device এর ব্লক যার থেকে তথ্য C.P.U তে প্রবেশ করবে। C.P.U হলো দ্বিতীয় ব্লক, যে ওই তথ্যকে তৃতীয় ব্লক Electronic Memoryতে লিখে রাখবে। এবার যখন ওই নির্দেশ অনুসারে কাজ করার দরকার হবে তখন C.P.U প্রয়োজন মতো মেমরি থেকে তথ্য পড়ে সেই কাজটি করে ফেলবে এবং I/O Device-এর মাধ্যমেই প্রোগ্রামারকে উত্তর বা ফলাফল জানিয়ে দেবে।

চিত্র 2-এর একটি IBM PC/AT compatible কম্পিউটারের ছবি দেখানো হয়েছে। এখানে I/O Device দুটি (মনিটর এবং কী বোর্ড) আলাদা করে দেখানো হয়েছে। আর মনিটরের নিচে রাখা বাক্সের মধ্যে রয়েছে C.P.U. এবং Electronic memory অংশ দুটি।

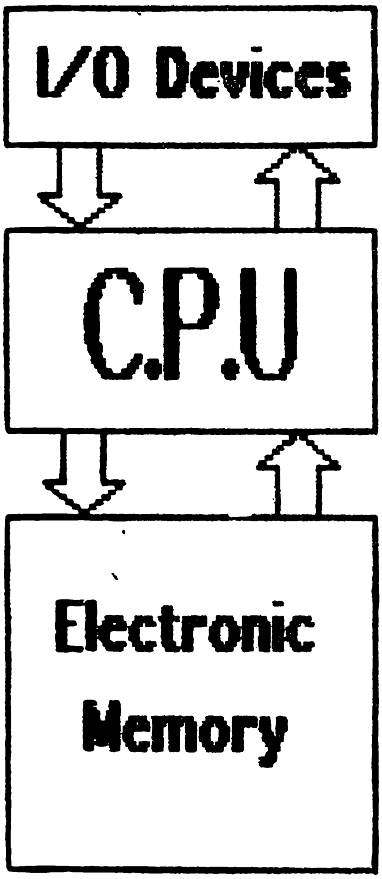

চিত্র—2

এই শব্দগুলি মনে রেখো

C.P.U.—সেণ্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। কম্পিউটারের মস্তিষ্ক স্বরূপ জটিল ইলেকট্রনিক সার্কিট।

Block diagram—কোনো জটিল যন্ত্রপাতি বা পদ্ধতিকে সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য বিশেষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রধান অংশ বা ধাপগুলি বাক্স বা Block-এর সাহায্যে চিহ্নিত করা থাকে এবং কোন কাজের পর কোন কাজটি করা হবে তা তীর চিহ্নের সাহায্যে দেখানো হয়।

I/O Device—ইনপুট আউটপুট ডিভাইসের সংক্ষিপ্ত রূপ। এর সাহায্যে C.P.U. এবং প্রোগ্রামার পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে।

Instruction Set—প্রত্যেক C.P.U.রই বিভিন্ন রকম কাজ করার ক্ষমতা থাকে। এই কাজগুলির মধ্যে থেকে কোনো একটি কাজ বেছে নিতে হলে C.P.U. তে সেই কাজটির জন্য বরাদ্দ একটি বিশেষ বিদ্যুৎ সংকেত পাঠাতে হয়। ইন্সট্রাকশন সেট হলো সেই বিভিন্ন কাজ ও তাকে বেছে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সংকেতের তালিকা।

Printer—কম্পিউটারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইলেকট্রনিক ছাপার যন্ত্র যার সাহায্যে চিঠি পত্র, ছবি, গ্রাফ ইত্যাদি কম্পিউটারের মাধ্যমে ছাপানো যায়। যেমন এই লেখার সঙ্গে যে সমস্ত ছবি দেওয়া হচ্ছে, তা সবই ওই প্রিণ্টারের সাহায্যে ছাপানো।

Plotter—কম্পিউটারের মাধ্যমে বড়বড় ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং গ্রাফ ইত্যাদি ছাপার যন্ত্র।

Scanner—যে কোনো ছবি বা হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিকে যথাযথ ভাবে কম্পিউটারের মেমরিতে রেকর্ড করার যন্ত্র।

Electronic Memory—কম্পিউটারের যাবতীয় তথ্য ও নির্দেশকে রেকর্ড করে রাখার ইলেকট্রনিক সার্কিট।

Digitizer—এর সাহায্যে প্রোগ্রামার কম্পিউটারের স্ক্রিনে ছবি আঁকতে পারেন।

Programme—C.P.Uকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার নির্দেশ।

Programmer—যিনি কম্পিউটারে প্রোগাম লেখেন।

Keyboard—টাইপরাইটারের মতো চাবিযুক্ত যন্ত্র। এর সাহায্যে প্রোগ্রামার কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করে থাকেন।

Periplurals—কম্পিউটারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সংযুক্তি।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মাবলী

গ্রাহক ও এজেণ্টদের প্রতি

● কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।

● প্রতি সংখ্যার মূল্য 4·50 টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র (April-March) গ্রাহক চাঁদা 50·00 টাকা। হাতে বই নিলে গ্রাহক চাঁদা 40·00 টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।

● Under Certificate of Posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত 30·00 টাকা পাঠাতে হবে।

● M. O বা Bank Draft KISHORE JNAN BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।

● 25 কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা 25 টাকা।

● ভি. পি. পি বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো সংখ্যাপিছু গ্রাহকদের 1·00 টাকা করে সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখতে হবে।

লেখকদের প্রতি

● বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী যে কোন বিজ্ঞান রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশের জন্য পাঠানো যেতে পারে।

● পাতার একদিকে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।

● প্রেরিত রচনা এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে অনুমোদিত হয়নি বলে ধরে নিতে হবে।

ক্যুইজ কনটেস্ট

গ্রেড I

জুন, 88 VII-VIII

1. বৃহস্পতি গ্রহের কটি উপগ্রহ আছে ?

2. সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে মঙ্গলএর কতো দিন সময় লাগে ?

3. হীরা, গ্রাফাইট, গ্যাস কার্বন, ভুসা কালি ও বোন ব্ল্যাক – এরা ভিন্ন রূপের হলেও, মূলতঃ এরা সবাই একই মৌলিক পদার্থ।—সেই মৌলিক পদার্থের নাম কি ?

4. 'ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম' গ্রন্থটির রচয়িতা কে ? ঐ গ্রন্থের প্রকাশকই বা কে ?

5. ফরাসী বিপ্লবের প্রধান স্লোগানটি কি ছিল ?

6. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা "তাসের দেশ" নাটকটি কাকে উৎসর্গ করেছিলেন ?

7. ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিনের মধ্যে স্বাভাবিক উষ্ণতায় কোনটি তরল পদার্থ ?

8. পৃথিবীর গভীরতম অরণ্যভূমি কোনটি ?

9. জবা ও রজনীগন্ধার মধ্যে কোনটি অবৃন্তক পুষ্প ?

10 এটি ভারতের এক অভিজাত কাপড় প্রস্তুত কারকের প্রতীক। এই প্রতীকের নাম কি ?

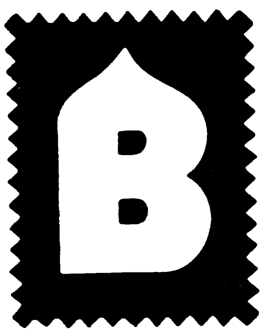

গ্রেড II

জুন, IX-X

1. ভুগোলে 'ভাঙ্গর' বলতে কি বোঝায় ?

2. বিশ্বের দীর্ঘতম গির্জা কোনটি ?

3. "বেদেই বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম নিহিত আছে"—এ বাণী কে প্রচার করেছিলেন ?

4. ফরাজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

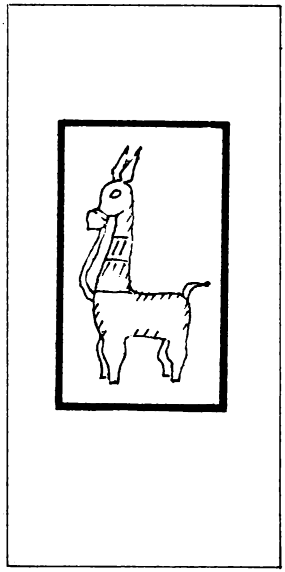

5. এই ছবিটি কিসের প্রতীক ?

6. পৃথিবীর 80%অলিভ অয়েল কোথায় উৎপন্ন হয় ?

7. কর্ণাটকের সর্ববৃহৎ জল বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের নাম কি ?

8. ক্যালসিয়াম কার্বনেটের স্বচ্ছ স্ফটিকের অপর নাম কি ?

9. উদ্ভিদ হরমোন 'অক্সিন' এর রাসায়নিক প্রকৃতি কেমন ?

10. পশ্চিমবঙ্গের কোথায় হাঙরের তেল নিষ্কাশিত হয় ?

গ্রেড III

জুন, 88 XI-XII

1. ওল এর মৃদ্গত কাণ্ডের নাম কি ?

2. B. H. C এর পুরো নাম কি ?

3. 'মেটামরফোসিস' কাকে বলে ?

4. ভরত-এর স্ত্রীর নাম কি ?

5. 'বীরবল' ছদ্মনামে কে সাহিত্য রচনা করতেন ?

6. ডয়টেরিয়াম কি এবং তার আবিষ্কর্তা কে ?

7. তিন মাইল = কতো লিগ ?

8. কোন শিলার নাম কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে রাখা হয়েছে ?

9. জিংক, বোরন, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি মৌলগুলিকে 'ট্রেস এলিমেন্টস' বলা হয় কেন ?

10. এই যন্ত্রটির দুটির নাম কি

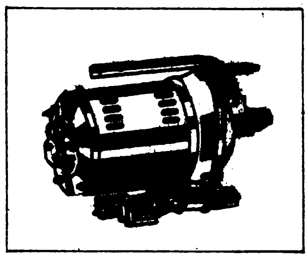

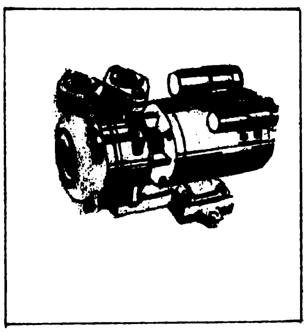

বিজ্ঞান সমাবেশ

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার গবেষণার 'মান' যথেষ্ট শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। তবে বিজ্ঞান মানসিকতার অভাবে এই 'মান' ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা। তাই বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ে ওঠা বিশেষ প্রয়োজন। গত 7মে সন্ধ্যায় মহাবোধি সোসাইটী হলে অনুষ্ঠিত এক বিজ্ঞান সমাবেশে এ কথাগুলি বলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ অশেষপ্রসাদ মিত্র। ভগবতী

সঙ্কর্ষণ রায়ের হাতে 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন বিজ্ঞানী ড. অশেষ প্রসাদ মিত্র।

বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দের 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। সভার সুরুতেই প্রয়াত প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন অন্নদাশঙ্কর রায়। সমাবেশের উদ্যোক্তা ছিলেন কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকা শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ও কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার 7ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ডঃ অশেষপ্রসাদ মিত্র আরও বলেন, ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চায় এখন এক যুগ সন্ধিক্ষণ চলছে। তিনি বলেন এই সময়ে কিশোর ও যুব সমাজকে যতটা বিজ্ঞানমুখী করা যায় ততই মঙ্গল। তিনি বলেন শিল্প, সাহিত্য সঙ্গীত চর্চার মতোই সমান আনন্দ রয়েছে বিজ্ঞান চর্চাতেও। তাছাড়া আধুনিক পৃথিবীতে বিজ্ঞান ওতপ্রোত ভাবেই জড়িয়ে রয়েছে আমাদের জীবনের সঙ্গে। 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিঃ আগামী দশকে' শীর্ষক আলোচনায় ডঃ মিত্র ভারতের গবেষণাগারগুলির উল্লেখ করে বিজ্ঞানের রোমাঞ্চকর অগ্রগতির কথা বলেন। আলোচনার সূচনা করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানলেখক সমরজিৎ কর।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বাংলায় প্রকাশিত জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রদর্শনী। খুদে বিজ্ঞানীদের কল্পনা ও কারিগরীর নিদর্শন হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছিল নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্রের সাউণ্ড সুইচিং সিস্টেম ও দেব কুমার রায়ের সাউণ্ড মাস্টার। মৃদু হাততালির শব্দে বাতি জ্বলে ওঠা ও নিভে যাওয়ার ঘটনা সকলকেই চমৎকৃত করে।

ক্যুইজ কনটেস্ট, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের পরিচালক জয়ন্ত দত্ত।

শিশুসাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য শৈব্যা পুস্তকালয় প্রদত্ত 'রণজিৎ স্মৃতি পুরস্কার' এবারে অর্পন করা হয় আনন্দ বাগচিকে। আর ছোটদের উপযোগী বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনার জন্য কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পুরস্কার অর্পন করা হয় সঙ্কর্ষণ রায়কে। সম্মানিত লেখকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন যথাক্রমে শ্রী অন্নদাশংকর রায় ও ডঃ অশেষপ্রসাদ মিত্র।

সভাপতির ভাষণে শ্রীঅন্নদা শংকর রায় বলেন আমাদের ছেলেবেলায় আজকের দিনের মতো রকমারি বিজ্ঞান সাহিত্য ছিল না। বিজ্ঞানের পত্রিকা ছিলনা বললেই চলে। আজকের ছোটরা এদিক থেকে অনেক ভাগ্যবান। তিনি বলেন ডঃ অশেষ প্রসাদ মিত্র এফ আর এস নির্বাচিত হওয়ায় আমরা গর্বিত। তিনি আরও বলেন আজকের দিনে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের মতো পত্রিকার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সুন্দর পত্রিকাটির কিশোর কিশোরীদের আকর্ষণ করবার ক্ষমতা আছে।

আনন্দ বাগচির হাতে 'রণজিৎ স্মৃতি পুরস্কার' তুলে দিচ্ছেন সভাপতি অন্নদা শঙ্কর রায়।

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকায় 7ম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে বাঁদিক থেকে আনন্দ বাগচি, প্রধান অতিথি ড. অশেষ প্রসাদ মিত্র, সভাপতি অন্নদাশঙ্কর রায়, সঙ্কর্ষণ রায় পত্রিকার প্রধান সম্পাদক সমরজিৎ কর।

সভাগৃহের ভিতরে ও বাইরে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ প্রকাশিত বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ও মানুষের জয়যাত্রা শীর্ষক রঙীন পোস্টার প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের পরিবেশ'কে যথেষ্ট তাৎপর্যময় করে তোলে।

অনুষ্ঠানের আর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল "গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য" শীর্ষক রঙীন তথ্যচিত্র। স্বভাব বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের জীবন ও গবেষণা নিয়ে তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করেছেন শ্রী ভাস্কর রায়।

বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান আলোচনা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান লেখক ও খুদে বিজ্ঞানীদের সমাবেশে—উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি সাংবাদিক ও সাহিত্যিকগণও।

স্বাগত ভাষণ দেন পত্রিকার সম্পাদক রবীন বল। প্রয়াত প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্মৃতিচারণ করে তিনি আজকের সমাবেশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

সপ্তম বার্ষিক পূর্তি অনুষ্ঠানে সমাগত অতিথিবৃন্দ।

শব্দকূট

মলয় ভট্টাচার্য জুন '88

উপর নিচ ঃ—

1. তড়িৎপ্রবাহ সংক্রান্ত একাধিক সূত্রের একটির প্রবক্তা। 2. যে পদার্থ অন্য পদার্থকে জারিত করে। 5. যে বিজ্ঞানী আলোকের গতিবেগ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। 7. তড়িৎশক্তির বিনিময়ে যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 8. জীবের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

পাশাপাশিঃ —

3. অধাতু কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় তরল। 4. ধাতু কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় তরল। 6. 'বায়োলজি' শব্দটির প্রতিষ্ঠাতা। 9. পরমাণুর নিউক্লিয়াস মধ্যস্থিত ধনাত্মক আধানযুক্ত কণিকা। 10. একটি নিষ্ক্রিয় মৌল।

প্রযত্নে—শ্রীপরিতোষ ভট্টাচার্য
6/23, বিবেকনগর, যাদবপুর, কলকাতা-75

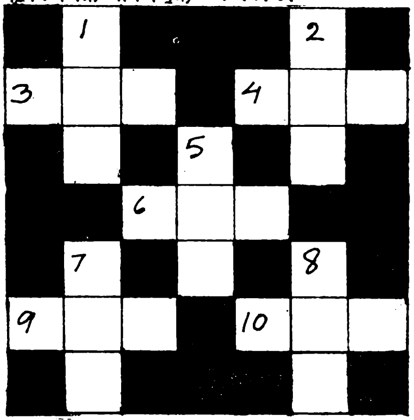

আই কিউ টেস্ট জুন '88

1. পরবর্তী সংখ্যাটি কত হবে—
   27, 23, 19, 15,...
2. নিয়ন বাতিতে তড়িতের পরিবহণ ঘটে—
   (a) গামা রশ্মির মাধ্যমে, (b) ভাস্বরতার মাধ্যমে, (c) আয়ন ও ক্যাথোড রশ্মির দ্বারা (d) প্রতিপ্রভার সাহায্যে।
3. ভারতের কোন অঞ্চলের লোকেরা ডোগ্‌রি ভাষায় কথা বলে—
   (a) পাঞ্জাব, (b) হিমাচল প্রদেশ, (c) জম্মু ও কাশ্মীর, (d) অরুণাচল।
4. ক্রম নিম্ন মান অনুসারে সাজাও—
   (a) পায়ের আঙুল, (b) গোড়ালি, (c) মাথা, (d) হৃদপিণ্ড, (e) ঘাড়।
5. নিচের বস্তুগুলির মধ্যে কোনটি ভিন্ন ধরনের—
   (a) টায়ার, (b) রঙ, (c) সেন্ট, (d) সাবান, (e) কাগজ।

ক্যুইজ কনটেস্ট সমাধান

এপ্রিল 88' গ্রেড I

1 না, হয় না। 2. তাল। 3. লিউকোপ্লাস্টিড। 4 মাউন্ট উইসন অবজারভেটারী। 5. তক্ষশীলার রাজা। আয়ন বলতে তড়িতাবিষ্ট পরমাণু বা পরমাণু সমষ্টিকে বোঝায়। 7. প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা। 8. জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ... 9. কুলীন কুলসর্বস্য (রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখিত) 10. ইন্দ্র।

এপ্রিল' 88 গ্রেড II

1. ল্যাক্টোমিটার যন্ত্র। 2. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। 3. ওভাম। 4. লিয়াকং আলী খান। 5. 2N হলো দুটি নাইট্রোজেন পরমাণু এবং N_2 হলো একটি নাইট্রোজেন অণু। 6. কলিচুনের দ্রাব্যতা উষ্ণতা বৃদ্ধিতে হ্রাস পায় বলে। 7. বিজ্ঞানী ওয়াল্টার ফ্লেমিং। 8. গণদেবতা, লেখক—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। 9. বাচস্পত্যাভিধান। 10. REALGAR

এপ্রিল' 88 গ্রেড III

1. মাইকেল ফ্যারাডে। 2. বিকীর্ণ তাপ পরিমাপের একটি সুবেদী যন্ত্র। 3. ডাচ পদার্থবিজ্ঞানী PIETER ZEEMAN. 4. অনেক ব্যাকটিরিয়ার কোষ প্রাচীর বস্তু সুতোর মত বাইরের দিকে নির্গত হয়। এদের 'পিলি' বলে। 5. পাঞ্চজন্য। 6. প্রমথ চৌধুরী। 7. মিউটেশন। 8. পাললিক শিলা। 9. দ্য লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস, ওয়াশিংটন ডি. সি.। 10 ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী WILSON CHARLES THOMSON REES.

আই কিউ টেস্ট সমাধান

আই কিউ টেস্ট / এপ্রিল '88-এর সমাধান

1. (b) দাঁড়াও, (c) দেখো, (a) যাও
2. (c) H_2S 3 (a) অ্যালকোহল
4. ছুঁচ বাদে বাকী সবকটি বিভিন্ন ধরনের লিভার।
5. 13. পূর্ববর্তী সংখ্যার সঙ্গে যথাক্রমে 1, −2, + 3 এবং − 4 যোগ করে পরবর্তী সংখ্যাগুলি এক এক করে পাওয়া গেছে।

শব্দকূট সমাধান

1পি	উ	2প্যা	■	3রে	টি	4না
না	■	স্কা	■	না	■	সা
■	■	ল	■	ল	■	■
5সি	উ	■	■	■	6প্যা	7ই
উ	■	8কো	■	9জী	■	থি
ক	■	স	■	পা	■	লি
10ব্র	জ	ন	■	11নে	প্চো	ন

বলতে পারো কেন ?

সুধাংশু পাত্র

গত মাসের নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর ঃ

আমরা যে মাংস খাই, তা হজম হয়ে যায়। কিন্তু পাকস্থলির মাংসপেশী হজম হয় না কেন ?

খাদ্যবস্তুকে হজম করতে হলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পেপসিন, ট্রিপসিন প্রভৃতি কতকগুলো উৎসেচকের সংস্পর্শে আসতে হয় এবং ওদেরই ক্রিয়ায় মাংস ইত্যাদি সব খাদ্যই হজম হয়। পাকস্থলী, খাদ্যনালী প্রভৃতি তথা পৌষ্টিক তন্ত্রের কলাকোষগুলি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দিয়ে আবৃত থাকে। ফলে তথাকার কোষগুলো উৎসেচক কিংবা পাচকরসের সংস্পর্শে আসতে পারে না। আর ঐ কারণে হজমও হয়ে যায় না।

এ মাসের প্রশ্ন

জোনাকিপোকা যে নীল নীল আলো বিতরণ করে তার উৎস কী ?

জানতে চেয়েছে (1) বিশ্বজিৎ সাহা, শ্রীপুর বাজার হুগলী এবং (2) কিংশুক মিশ্র, গোবিন্দপুর-কৈলাশহর উঃ ত্রিপুরা।

প্রঃ কেমন করে সূর্যের সৃষ্টি হয়েছে ? (1) অরবিন্দ দে, সালার-মুর্শিদাবাদ।

উঃ প্রথমে উল্লেখ করতে হয় যে, সূর্য এককভাবে সৃষ্টি হয়নি। সূর্য যে নক্ষত্র জগৎ বা গ্যালাক্সির অন্তর্ভুক্ত সেই গ্যালাক্সির বহু সূর্যের জন্ম হয়েছে একই সময়ে আজ থেকে প্রায় 460 কোটি বছর আগে।

বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস মহাকাশে অবস্থানকারী বিরল গ্যাস কণা ও ধূলিকণা থেকে এক একটি গ্যালাক্সির লক্ষ-লক্ষ সূর্য এবং তাদের গ্রহগুলীর সৃষ্টি হয়েছে। আদিতে সহস্র-সহস্র কোটি আলোক বর্ষ-ব্যাস যুক্ত বিশাল আয়তনের গ্যাস ও ধূলিকণার মধ্যে কোন চঞ্চলতা সৃষ্টি হলে সেগুলি কালক্রমে ঘনীভূত হয়ে আবর্তন শুরু করে এবং বর্তুলাকার প্রাপ্ত হয়। প্রথম প্রথম এই কাজটি সম্পন্ন হতে থাকে অতি ধীর ও মন্থর গতিতে। তারপর গ্যাস যত ঘনীভূত হয় ততই তার আকর্ষণ বল ও তাপ মাত্রা দুইই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় কিছু কিছু তাপ বিরল বায়ুস্তর ভেদ করে বর্হিবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে বলে আকর্ষণ বল ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে এবং সঙ্কোচনের মাত্রাও প্রবল থেকে প্রবলতর হয়।

অপরদিকে সঙ্কোচনের মাত্রা বেড়ে উঠলে গ্যাস স্তূপের হাইড্রোজেন পরমাণুদের অস্থিরতা বেড়ে উঠে। এবং ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করতে শুরু করে। ফলে ধূলিকণার সঙ্গে সংঘর্ষে কিছু কিছু হাইড্রোজেন অণুর সৃষ্টি হয়। আর অণুগুলো উৎপন্ন হলে স্তূপের তাপমাত্রা কিছুটা কমে গিয়ে সঙ্কোচনের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়।

পরিশেষে সঙ্কোচনের মাত্রা এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, একই জায়গায় কোটি কোটি পরমাণু সন্নিবিষ্ট হয় এবং তাপমাত্রা ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়ে উঠে। বেড়ে উঠে আবর্তন বেগও। এই অবস্থায় প্রায় তিন হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের মত তাপমাত্রায় ধূলিকণাগুলোও গ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। ঘনত্ব এত বেড়ে উঠে যে এক ঘন সেণ্টিমিটারে কেন্দ্রীভূত বস্তুরাশির ওজন দাঁড়ায় কয়েক টনের মত।

এত প্রচণ্ড তাপমাত্রা ও ঘনত্বে গ্যাসীয় স্তূপটি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। এক সময় ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরণ ঘটে। স্তূপটি সহস্র সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

খণ্ডগুলির এবং একটির আয়তনও বড় কম থাকে না। উপাদান সেই একই। অর্থাৎ হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও গ্যাসীয় অবস্থায় ধূলিকণা। এদের নিজস্ব আকর্ষণ বল থাকে এবং পূর্বের মতই আবর্তন করতে থাকে। আবর্তন করতে করতে একদিন এরাও সংকুচিত হয় এবং তাপমাত্রা ও ঘনত্ব দুইই বেড়ে উঠে। এই অবস্থায় এদের বলা হয় "প্রোটো সান।"

প্রোটোসান ঠিক ঠিক সূর্য নয়। এর পরেও সঙ্কোচন চলে এবং থার্মোনিউক্লিয়ার প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়ে উঠলে একদিন দপ দপ করে জ্বলে উঠে। তখনই নক্ষত্র তার পরিপূর্ণ রূপ প্রাপ্ত হয়।

আমাদের সূর্যও অনুরূপ প্রক্রিয়ায় সম্ভবত 460 কোটি বছর আগে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছে। এটি মাঝারি ধরনের একটি নক্ষত্র। প্রায় হাজার কোটি বছর এর পরমায়ু।

প্রঃ চাঁদে গেলে মানুষের ওজন কম হয় কেন ? শুভজিৎ মণ্ডল, ফুলিয়া-নদীয়া।

উঃ চাঁদের বায়ুমণ্ডল নেই এবং আকর্ষণ বলও পৃথিবীর 6 ভাগের একভাগ মাত্র।

প্রঃ সৌরকলঙ্ক কী ? দেবাশিস্ ধর। নিউকলোনী, বঙ্গাই গাঁও-গোয়ালপাড়া-আসাম।

উঃ গাঢ় রঙিন কাচের ভেতর দিয়ে সূর্যপৃষ্ঠকে লক্ষ্য করলে অসংখ্য কালো কালো দাগ দেখা যায়। এইগুলিকে সৌরকলঙ্ক বা সান স্পট বলে।

সূর্য যেহেতু গ্যাসীয় পিণ্ড এবং তার অভ্যন্তরে ভয়ঙ্কর সব বিস্ফোরণ সংঘটিত হচ্ছে। তাই তার গ্যাসসমুদ্রে অহরহ প্রবল ঝড় ওঠার ফলে গ্যাসগুলো এক এক জায়গায় ঢেউয়ের মত উঁচু-নিচু হয়ে বিশাল বিশাল গহ্বরের সৃষ্টি করে। এই গহ্বরগুলো এত বিশাল যে তার মধ্যে দু-একটি পৃথিবীও তলিয়ে যেতে পারে। অথচ দূরে থাকার জন্য ঐ গহ্বরগুলোকে কালো কালো রেখা বিন্দুরমত আমরা দেখতে পাই। প্রকৃতপক্ষে ঐ গহ্বরগুলিকেই আমরা সৌরকলঙ্কের আকারে দেখি। বলা বাহুল্য, সূর্য-গ্যাসীয় পিণ্ড বলে গহ্বরগুলো ক্ষণস্থায়ী। দু-এক ঘণ্টা থেকে দু-এক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। দেখা গেছে, সূর্যে নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে 5° থেকে 30° দূরত্বের মধ্যে সর্বাধিক সৌরকলঙ্কের উদ্ভব হয়।

প্রঃ মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু কোথায় ও মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আরও বহু প্রশ্ন রেখেছেন সি সি ব্লক, সল্টলেক-কলিকাতা 64 থেকে জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

উঃ মহাবিশ্ব সম্বন্ধে গত ডিসেম্বর-87 সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। একটু খোঁজ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আর মহাবিশ্বের কেন্দ্র বিন্দু কোথায়-এর উত্তরে জানাই যে, মহাবিশ্বের কুলকিনারা জানা বর্তমানে মানুষের সাধ্যের বাইরে। কোথায় বিগব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিল, পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব কত, মহাবিশ্বের কেন্দ্র কোথায়, ইত্যাদি বলার কোন উপায় নেই। এমন ক্ষেত্রে পৃথিবীকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বলে ধরতে হবে। তার কারণ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হতে আছে। অর্থাৎ গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে বা অপসারিত হচ্ছে। এই অপসরণ বেগ আবার দূরের গ্যালাক্সিগুলোর ক্রমান্বয়ে বেশি। 1300 কোটি আলোকবর্ষ দূরে অপসরণ বেগ আলোকের গতিবেগের প্রায় সমান।

অতএব 1300 আলোকবর্ষ দূরের কোণ নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে কোনদিনই আসতে পারবে না। সেই কারণে আপাততঃ মানুষের কাছে মহাবিশ্বের ব্যাস 2600 কোটি আলোকবর্ষ।

প্রঃ শীতকালে সরষের তেল জমে না কিন্তু নারকেল তেল জমে যায় কেন ? পার্থসারথি বেরা, কেটেরা তারকেশ্বর-হুগলী।

তেলে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। কিন্তু নারকেল তেলে ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রাধান্য সরষের তেল, রেপসীড তেল ইত্যাদি থেকে বেশি। এইজন্য নারকেল তেল শীতকালে জমে যায়।

প্রঃ ডিম আমিষ না নিরামিষ ? বর্ণালী রায়, বজবজ-বাওয়ালী-দঃ 24 পরগনা।

উঃ কোন বস্তু আমিষ কিংবা নিরামিষ তার চুলচেরা বিচার সম্ভব নয়। খাদ্যে প্রোটিনের আধিক্যকে যদি আমিষ আখ্যায় ভূষিত করা যায়, অথবা প্রাণিজ খাদ্যকে যদি আমিষ বলতে হয় তাহলে দেখা যাবে উদ্ভিজ্জ খাদ্য ডাল, সোয়াবিন, বাদাম ইত্যাদিতে প্রোটিনের ভাগ মাছ মাংসের চেয়ে অনেক বেশি। তাদের তুলনায় ডিমে প্রোটিনের পরিমাণ ঢের কম। প্রায় অর্ধেকের মত। তবে ডিম প্রাণিজ খাদ্য।

প্রঃ বিজ্ঞানের কোন্ তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন ? তাঁর ঐ তত্ত্বটিকে কি সত্যেন্দ্রনাথ বসু সংশোধন করেছিলেন ? পার্থ সিংহ, ইটা ডাংরা—বাঁকুড়া।

উঃ ফটো ইলেক্ট্রিক এফেক্টের ব্যাখ্যার জন্য 1921 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইনকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এটিকে সত্যেন বসু সংশোধন করেন নি! তিনি সংশোধন করেছিলেন আইনস্টাইন প্রবর্তিত "সাধারণ আপেক্ষিকতা বাদ" নামক তত্ত্বটিকে। ঐ তত্ত্বটিকে নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বসু লক্ষ্য করেন, এটি পদার্থের পরমাণু এবং পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার উপর প্রযোজ্য হতে পারে না। বলবিদ্যার স্থির ও চলমান বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 1923 খ্রীস্টাব্দে তিনি এক নতুন পরিসংখ্যান প্রণালী উদ্ভাবন করেন। আলোর কণিকার ক্ষেত্রে ওকে প্রয়োগ করে যখন ভাল ফলই হলো তখন আইনস্টাইনই বসুকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, এবং পদার্থবিদ্যায় এই প্রণালীর নাম হয়েছিল "বসু পরিসংখ্যান"। অতঃপর আইনস্টাইন ঐ পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে একক পরমাণু যুক্ত গ্যাসের একটি নতুন সংখ্যাতত্ত্ব প্রকাশ করেন এবং নাম দেওয়া হয় "বোস আইনস্টাইন সংখ্যায়ন।"

প্রঃ এক্স রশ্মি কে কিভাবে আবিষ্কার করেন ? সৌমেন মণ্ডল, বেনাপুর হাওড়া।

উঃ উজবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়ম রঞ্জেন এটি আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করেন। কথিত আছে, সদ্য আবিষ্কৃত ক্যাথড রশ্মিকে নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন রঞ্জেন। এক সময় বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হওয়ায় যন্ত্রটিকে চালু

অবস্থায় বাক্সের ভেতরে বন্ধ করতে গিয়ে পাশে ঝুলন্ত অবস্থায় বেরিয়াম প্ল্যাটিনো সায়ানাইট মাখানো একটা পর্দায় এক ধরনের উজ্জ্বল আলোর আভাকে ঝলমল করতে দেখেন। কৌতূহলী হয়ে ঐ আলোর সামনে নিজের ডান হাতটা ধরতে দেখতে পেলেন, পর্দায় হাতের হাড়গুলোর ছবিই ভেসে উঠলো।

বাইরে না গিয়ে রঞ্জেন অতঃপর পূর্বের পরীক্ষাগুলো একে একে করে ঐ রশ্মি উৎপাদনের কৌশল আয়ত্ত করেন। কিন্তু ওকে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হন তিনি। শুধু এইটুকুই বুঝতে পারেন, এই রশ্মি সাধারণ আলোক রশ্মি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অজানা এই রশ্মিটির তাই সেদিন তিনি নামকরণ করেছিলেন ইংরেজী 'X' অক্ষর দিয়ে অর্থাৎ অচিন রশ্মি নামে।

প্রঃ সাইক্লোট্রোন কী? রজত পাল, টোলরোড হাইলাকান্দি, কাছাড় আসাম।

উঃ একটি ত্বরণযন্ত্র বা অ্যাকসিলারেটর। 1931 খ্রীস্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে গবেষণাগারে প্রস্তুত করেছিলেন বিজ্ঞানী আর্নেস্ট লরেন্স।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের দিকে কৃত্রিমভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রস্তুত করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা পরমাণুর কেন্দ্রকে আলফা কণার পরিবর্তে প্রোটনকে দিয়ে আঘাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এবং অন্যান্য কণা থেকে একমাত্র প্রোটনকে বাছাই করে তাকে ত্বরিত করার একটি যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কিন্তু অসুবিধা ছিল অনেক। প্রধান অসুবিধা, স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা নির্গত আলফাকণার শক্তি অতি সামান্যই অথচ পরমাণুর কেন্দ্রকের মধ্যে ক্রিয়া ঘটাতে হলে কয়েক কোটি ভোল্টের মত শক্তির প্রয়োজন। অপরদিকে এত উচ্চ বিভব ধারণ করার মত অপরিবাহী মাধ্যম তখনও আবিষ্কৃত হয়নি! এইগুলি শেষ পর্যন্ত বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রথমে কক্রফট ও ওয়ালটন নামে দুজন বিজ্ঞানী "ক্যাসকেড জেনারেটর" নামে এক ধরনের যন্ত্র উদ্ভাবন করলেও বিশেষ সুবিধা হয়নি বিজ্ঞানীদের। অবশেষে আর্নেস্ট লরেন্সই সমস্ত সমস্যার সমাধান করেন সাইক্লোট্রোন যন্ত্র উদ্ভাবনের মাধ্যমে।

প্রথম প্রথম উক্ত যন্ত্রটিরও অসুবিধা ছিল অনেক। পরবর্তীকালে অনেকের হাতে পড়ে এটির উন্নতি হয়েছে এবং কেবল প্রোটনকে নয় অপরাপর কণিকাকেও ত্বরান্বিত করার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। বর্তমানে এর উন্নতি হতে হতে এক অতিকায় ও ভারী যন্ত্রের রূপ নিয়েছে। এদের মধ্যে তার আদিরূপ আর বজায় নেই এবং ভারী শিল্প ছাড়া ওকে প্রস্তুত করাও সম্ভব নয়।

জল নিয়ে খেলা

অপরাজিত বসু

আয়তক্ষেত্রের আকারে দু'টো ছোট কাচের টুকরো নাও। দেখে নেবে, তারা যেন একই সাইজের হয়। ছবি বাঁধাইয়ের দোকানে অথবা আয়নার ফ্যাকটরীতে ফেলে দেওয়া কাচ দিয়ে এ কাজ হবে। কাচ দুটিকে এক সঙ্গে রেখে একটি প্রান্তের দিকে দু'টোর মাঝে দু'টি ছোট্ট বালির দানা বসিয়ে দাও এবং সমস্তটাকে একটা গার্ডার দিয়ে বাঁধ। এর ফলে কাচের পাত দু'টোর একদিক পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসে থাকবে। অন্যদিকে একটু ফাঁক থাকবে।

এবার, একটা পাত্রে জল নিয়ে তাতে অল্পকয়েক ফোঁটা লাল কালি ঢাল। জলটা লাল হয়ে যাবে। কাচের পাত দু'টোকে ঐ অবস্থায় লাল জলে ডুবিয়ে দাও। দেখ, ডোবাবার সঙ্গে সঙ্গে কাচের মধ্যে জল উঠে এসেছে এবং কেমন একটা ডিজাইন তৈরি হয়েছে। যেই তুমি লাল জল থেকে কাচের পাত তুলে নেবে, অমনি কাচের পাতের জলও ভ্যানিস হয়ে যাবে।

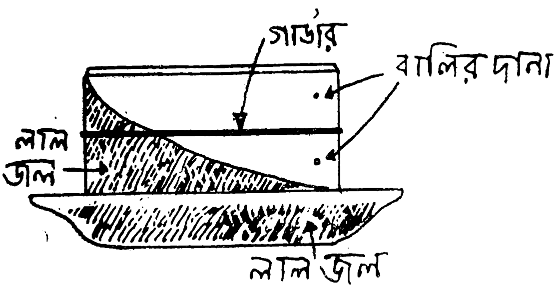

কেন এমন হচ্ছে? তোমরা জান যে তরলে পৃষ্ঠটান আছে। এবং পৃষ্ঠটানের জন্যই জল কৈশিক নল বেয়ে উঠতে পারে। কৈশিক জল যত সরু হবে, জল তত উঠবে। কাচের পাত দুটির একদিকে ফাঁক বেশি, অন্যদিকে কম। যে দিকে ফাঁক কম, সেদিকে পৃষ্ঠটানের জন্য জল অনেকটা উঠে যাবে অন্য দিকে কম! জলের এমন মজার খেলা দেখে তোমার যেমন ভালো লাগবে অন্য পাঁচজনেও মজা পাবে। জলের বা তরলের পৃষ্ঠটান বোঝাবার এমন সুন্দর খেলা আর দু'টি নেই।

যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন

১। যদি দু সপ্তাহেরও বেশি আপনার লাগাতার কাশি থাকে অথবা যদি দেখেন স্প্যুটাম বা থুতুর সঙ্গে রক্ত আসছে তবে হয়তো আপনার ফুসফুসে টি বি. হয়ে থাকতে পারে।

২। কাছাকাছির প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডিস্পেন্সারি অথবা টি বি. সেন্টারে গিয়ে নিজেকে, বিশেষ করে স্প্যুটাম পরীক্ষা করান।

৩। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নির্ধারিত সময় পর্যন্ত নিয়মিত ওষুধ খেলে যক্ষ্মা রোগ সেরে যায়।

৪। রোগ সারানোর চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করাই ভাল। তাই আপনার সন্তানকে বি.সি জি. টীকা লাগিয়ে নিন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো (ডি.জি.এইচ.এস)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, কোটলা রোড
নিউ দিল্লী-১১০০০২

davp 87/585 Ben

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার 7ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান হয়ে গেল গত 7মে 1988 অনুষ্ঠানে তোমাদের অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়েছে—আবার আসতে পারো নি অনেকেই। মডেল প্রতিযোগীদের মধ্যে অনেকেই যোগাযোগ করে আসতে পারো নি কেন বুঝতে পারলাম না।

যারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারোনি অথচ সফল প্রতিযোগী তাদের সার্টিফিকেট ও পুরস্কার 31 জুলাই 1988-এর মধ্যে সংগ্রহ করে নেবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ঐ তারিখের পর—তাদের সার্টিফিকেট ও পুরস্কার ডাকযোগে পাঠানো হবে।

পরিচালক

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

বিঃ দ্রঃ মডেল প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে নির্মলেন্দুবিকাশ পাত্র ও দেবকুমার রায় প্রথম ও দ্বিতীয় নির্বাচিত হয়েছে। এদের দুজনকেই মডেলের নির্মাণ ব্যয় ও সার্টিফিকেট নেবার জন্য দপ্তরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সফল উত্তরদাতাদের নাম

এপ্রিল '88-এ প্রকাশিত কুইজ কনটেস্ট গ্রেড I-এর সর্বাধিক নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবেঃ

1. **ধ্রুবজ্যোতি বসু** 144, রাজা রামমোহন রায় রোড কলকাতা-700008
2. **রূপাঞ্জন সাহা** প্রযত্নে, রবীন্দ্র কুমার সাহা কে. জি. এঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট পোস্ট-বিষ্ণুপুর জেলা-বাঁকুড়া-722122
3. **সুলতা বসাক** প্রযত্নে, লক্ষ্মীনারায়ণ বসাক 10, রবীন্দ্র পল্লী, কৃষ্ণপুর সুনীল জ্যোতি অ্যাভেনিউ কলকাতা-700059

এপ্রিল '88-এ প্রকাশিত কুইজ কনটেস্ট গ্রেড II-এর সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবেঃ

1. **সুব্রত দে** (নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, করুণাময় দাস গ্রাম—উটপাথর পোস্ট—নিমপুরা জেলা—মেদিনীপুর
2. **সৃজন সাঁতরা** (আটটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, অনন্ত গোপাল সাঁতরা 20, কৈলাস নগর, পোস্ট—ব্যাণ্ডেল, জেলা—হুগলী পিন—712123
3. **সোনালী পিলসিমা** (আটটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) 54, গৌরাঙ্গ-তলা পোস্ট—খাগড়া, জেলা—মুর্শিদাবাদ

এপ্রিল '88-এ প্রকাশিত কুইজ কনটেস্ট গ্রেড II-এর সর্বাধিক আটটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছেঃ

কলকাতাঃ মুকুলেশ দেবনাথ; **হুগলীঃ** মহুয়া চ্যাটার্জী; **বর্ধমানঃ** তরুণ তপন গরাই; **মালদহঃ** সুপ্রিয় মণ্ডল; **দার্জিলিঙঃ** ধ্রুব দাস মহলানবীস।

এপ্রিল '88-এ প্রকাশিত কুইজ কনস্টেট গ্রেড III-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে যে তিনজন পুরস্কৃত হবেঃ

1. **চঞ্চল বসু** 27/4, নারায়ণ চন্দ্র সেন লেন, হাওড়া—6
2. **উৎপল শেঠ** প্রযত্নে, ব্যোমকেশ শেঠ, বাঁশবেড়িয়া কুণ্ডুগলি, পোস্ট—বাঁশবেড়িয়া, জেলা—হুগলী—712502
3. **দিলীপ দাস** প্রযত্নে, করুণাময় দাস, গ্রাম—উটপাথর পোঃ—নিমসুরা জেলা—মেদিনীপুর।

এপ্রিল, '88-এ প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে দশজন সার্টিফিকেট পাবে ঃ

1. **অরূপ কুমার ঝা**, গ্রাম ও পোস্ট—একবর্ণ, জেলা—মালদহ।

2. **তপন কুমার বসাক** প্রযত্নে, আনন্দ মোহন বসাক, গ্রাম—নং 2 নূতন ফুলিয়া, পোস্ট - ফুলিয়া কলোনী, জেলা—নদীয়া—741402

3. **দেবজ্যোতি দেবনাথ** প্রযত্নে, বীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ 9, ডঃ পি. এস. মুখার্জী রোড বেলঘরিয়া, কলকাতা—700056

4. **প্রণব চক্রবর্তী** প্রযত্নে, কানাই চক্রবর্তী, গ্রাম—জগন্নাথপুর, পোস্ট—ফুলেশ্বর, জেলা—হাওড়া।

5. **দেবজ্যোতি পাণি** প্রযত্নে, সুনীল কুমার পাণি B2/80/2, ভি. কে. নগর, দুর্গাপুর—10 জেলা বর্ধমান।

6. **মিনতী ঘোষ**, জয়রামপুর (এস. টি. রোড) শুকদেবপুর 24 পরগনা—743503

7. **দীনেশ চন্দ্র সাহা**, গ্রাম ও পোস্ট—দক্ষিণ রায়পুর, ভায়া—বিড়লা-পুর, জেলা – দক্ষিণ 24-পরগনা।

8. **সুজন সাঁতরা** 20, কৈলাসনগর, পোস্ট –ব্যাণ্ডেল জেলা—হুগলী 712123

9. **উদয়ন মজুমদার** 41/34, জি. পি. রোড হালিশহর, খাসবাটি পোস্ট—হাজিনগর, জেলা—উত্তর 24-পরগনা।

10. **কৌশিক সুর** 190, আন্দুল রোড গভঃ রেণ্টাল হাউসিং এস্টেট ফ্ল্যাট নং RL-6 হাওড়া—9

ঘোষণা

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার বার্ষিক সমাবেশে যারা উপস্থিত থাকতে পারোনি তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে 31শে জুলাইয়ের মধ্যে উপযুক্ত পরিচয় পত্র সহ দপ্তর থেকে তাদের সার্টিফিকেট ও পুরস্কার নিয়ে নেবার জন্য। 31শে জুলাইয়ের পর তাদের সার্টিফিকেট ও পুরস্কার ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

পরিচালক ঃ কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

ক্যুইজ কনটেস্টের ধরন-87 সালে যা ছিল-88তেও তাই রয়েছে। আমাদের ইচ্ছে ছিল ধরনটা বদল করার কিন্তু নানা কারণে সম্ভব হয় নি। তবে 89 সালে তা অবশ্যই বদল করা হবে।

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে **পুরস্কৃত** করা হবে। তিনজনেরই **পুরস্কারের মূল্যমান সমান।**

আই-কিউ-টেস্টের সফল উত্তর-দাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে 10টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

জুন '88 সংখ্যার
ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

গ্রেড 1 **সুধাংশু পাত্রের**
বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ

গ্রেড2 **দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**
পৃথিবী পরিচয়

গ্রেড 3 **রতন মোহন খাঁ**
আরও গণিত ক্যুইজ

প্রতিযোগিতার কুপন

ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড—1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টের উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি ....

....

বাড়ির ঠিকানা...

....

বয়স.........................শ্রেণী ....

বিদ্যালয়ের নাম ....

....

আই কিউ টেস্ট / ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1/2/3-এর উত্তর পাঠালাম।

ইমার্জেন্সি ফ্যান

ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়

ইমার্জেন্সি লাইট তো আমরা অনেকেই দেখেছি, তা বলে ইমার্জেন্সি ফ্যান ? একটা নতুন জিনিস তাই না ? তাহলে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে নাও—

1. একটি মোটর
2. C₁—·04 μF—1টা
3. 1·5v ব্যাটারি—4টা
4. ব্লেড (পাখার) 3টা
5. তার, রং, স্ট্যাণ্ড ইত্যাদি।

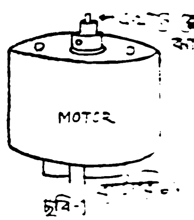

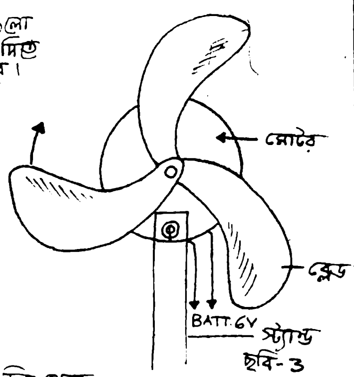

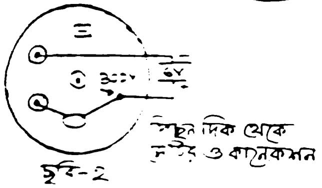

এগুলি সবই রেডিওর দোকানে পাওয়া যাবে। ব্লেড শক্ত অ্যালুমিনিয়ামের পাত থেকে ছবির মত করে তৈরি করে 1নং চিত্রে যেখানে ঝালা দিতে বলা হয়েছে সেখানে ঝালা দিয়ে দাও। এবার ব্লেডটার অগ্রভাগ একটু নিম্নমুখী করে দাও। ছবি 2-এর মত কানেকশন শেষ কর। ব্যাটারি সংযোগ কর। দেখ, কি সুন্দর পাখা তৈরি হয়ে গেছে। গরমের দিনে এটা খুব কাজে আসবে। বর্তনীতে 9v ব্যবহার করে একটি 2.2kΩ Preset বা Potentiometre ব্যবহার করে রেগুলেট করতে পার, একটা স্ট্যাণ্ড তৈরি করে তাতে আটকে দিতে পার, খেয়াল রাখবে পাখা যেন ছবি 3-এর তীর চিহ্নিত দিকে ঘোরে. মনে রাখবে মোটর-এর body possitive supply-এ যাবে।

14নং রায়নগর পার্ক, বাঁশদ্রোণী, 24 পরগনা

ওয়াটার হিটার

সিদ্ধার্থ বসু

ছোট বন্ধুরা আমি আজ তোমাদের এমন একটি জিনিস তৈরি শিখিয়ে দেব যেটা তোমাদের অনেক কাজে আসবে আবার খুব সহজেই তৈরি করতে পারবে। এর সাহায্যে 5 মিনিটের মধ্যে জল গরম করতে পারবে ! তোমাদের দরকার—

1. 4″ × 4″ কাঠের টুকরো
2. 2টি পুরোনো ব্যাটারি
3. তার, প্লাগ
4. ঝাল, ফুটো করার যন্ত্র, মোম ইত্যাদি।

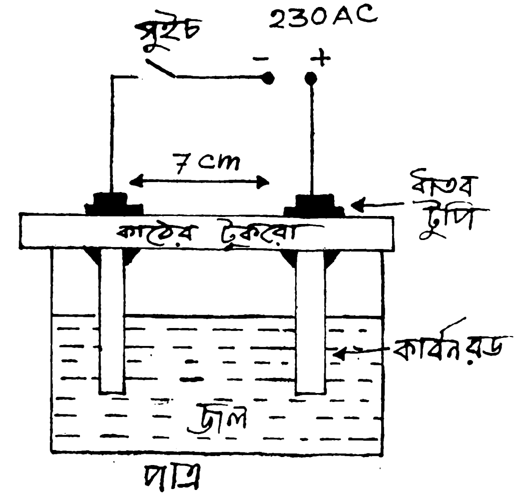

প্রথমে ঐ পুরোনো ব্যাটারী দুটো ভাঙ্গ, লক্ষ্য রাখবে কার্বন রড দুটো যেন অক্ষত থাকে, রড দুটোর মাথার ধাতব টুপি দুটি যেন ঠিক থাকে। এইবার কাঠের টুকরোটিতে 7 সেমি দূরত্বে দুটি ফুটো করো যাতে রড দুটি স্বচ্ছন্দে গলে যেতে পারে। এইবার রড দুটি ঢুকিয়ে দাও। খেয়াল রাখ' ধাতব টুপিটি যেন বাইরে থাকে। এবার মোম দিয়ে রড দু' ভালভাবে আটকে দাও। তারটিকে ঝাল দিয়ে টুপিটির সঙ্গে আটকে দাও। এবার একটি অপরিবাহ' তৈরি পাত্রে জল ঢাল এবং হিটারটির কার্বন দণ্ড ডুবিয়ে দাও। কাঠের টুকরোটি যেন পাত্রের ওপ' বিদ্যুৎ সংযোগ কর, 5 মিনিটেই জল গরম হবে

বিঃদ্রঃ ইচ্ছে হলে সুইচ রাখতে পার

শরীয়তপুরে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের স্মরণ-সভা

শরীয়তপুর। প্রয়াত বিজ্ঞান সাধক ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের সপ্তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে 8ই এপ্রিল বিকেল 5টায় স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে নিউট্রন সংঘ, বোটানিকাল সার্ভে অব শরীয়তপুর ও শরীয়তপুর বিজ্ঞান ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বোটানিকাল সার্ভে অব শরীয়তপুরের সভাপতি জনাব এম, এ আজিজ মিয়া, সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবি শ্রীরথীন্দ্র কান্ত ঘটক চৌধরী এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইদিলপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মোঃ মোখলেছুর রহমান ও শরীয়তপুর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মোঃ সিরাজুল হক।

সভাপতির ভাষণে এম এ আজিজ মিয়া দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিজ্ঞান কর্মী ও বিজ্ঞানোমোদীরা বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্ম থেকে বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান অনুশীলনে সবিশেষ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করবে, বিজ্ঞান ভাণ্ডারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হবে। সভাশেষে শরীয়তপুর বিজ্ঞান ক্লাবের সৌজন্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান প্রজেক্ট প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানটি সুধীজন কর্তৃক প্রশংসিত হয়।

'উৎস মানুষ'-এর আড্ডা

এবারের আড্ডা বসেছিল 22মে রবিবার। 1988। স্থান যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। আমন্ত্রণ লিপিতে বলা হয়েছে—'পত্রিকার পাঠক, লেখক ও পরিচালক মণ্ডলীর যোগসূত্রকে আরও প্রাণবন্ত আরও কার্যকর করে তোলার জন্যেই এ আড্ডা। আসুন আমাদের প্রত্যাশা-হতাশা-অভিজ্ঞতার পরামর্শ দিয়ে পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে তুলি—এ প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলি।'

এক দিনের এই আড্ডা দারুণ ভাবে জমেছে বলে আশা করি।

জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ এর প্রথম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন

জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল গত 14 মে 1988। মহাবোধি সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন মধ্য-শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক প্রগোপাল মুখোপাধ্যায়।

তিরোল হাইস্কুলে রামানুজন রামন জন্মশত বার্ষিকী

শ্রীনিবাস রামানুজন সি ভি রামনের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে কিশোর কল্যাণ পরিষদ আয়োজিত বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে গত 7 মে 88তে হুগলী জেলার তিরোল হাইস্কুলে সারাদিন ধরে নানা কর্মসূচী অনুসৃত হয়। সাধারণ মানুষের মনে বিজ্ঞান-চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্যে সকালে স্থানীয় বিভিন্ন স্কুলের প্রায় এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা পোস্টার নিয়ে পল্লী পরিক্রমা করেন। এরপর বিদ্যালয় ভবনে রামানুজন রামনের আলোকচিত্র ও ছাত্রছাত্রীদের তৈরি নানা মডেলের প্রদর্শনী উদ্বোধন হয়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রামানুর্জন সম্পর্কে প্রতিযোগিতামূলক আলোচনায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয় যথাক্রমে শুভেন্দু কুণ্ডু, শর্বরী দাস ও কল্যাণ কুণ্ডু এবং রামন সম্পর্কে আলোচনায় যথাক্রমে অনিন্দ্য কর, তাপস সাহা ও শুভ্রাংশু মালিক। কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে বালী ও তিরোল হাইস্কুলের ছাত্ররা। অপরাহ্নে মূল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা ও শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুদ্ধি ও মেধা চর্চার জন্য

অমরনাথ রায় ॥ **নলেজ ক্যুইজ** ১০
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ **গণিত ক্যুইজ** ১০
অমরনাথ রায় ॥ **সায়েন্স ক্যুইজ** ১০
অলক চক্রবর্তী ॥ **ফিজিক্স ক্যুইজ** ১০
অমরনাথ রায় ॥ **কেমিস্ট্রী ক্যুইজ** ১০

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

লীলা মজুমদার ॥ কল্পবিজ্ঞানের গল্প ১৫
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ লুপ্তধন ৮
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ মেঘনাদ ১০
অদ্রীশ বর্ধন ॥ কিশোর সায়েন্স ফিকশন ১৫
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য
তুষারলোকের রহস্য ৮

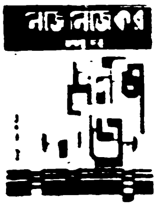

কারিগরী বিদ্যার প্রথম পাঠ
সহজ সরল ব্যাখ্যাসহ প্রায় অর্দ্ধশত মডেলের সচিত্র নির্মাণ প্রণালী
জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত
নিজে নিজে কর ১০

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ॥ **বিচিত্র বিজ্ঞান** ৮
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ **যুক্তিতর্ক হেঁয়ালি** ৮
বিমান বসু ॥ **গ্রহ পরিচয়** ১২
পার্থসারথি চক্রবর্তী
মাটি থেকে আকাশে ১০
অমরনাথ রায় ॥ **সংখ্যা নিয়ে খেলা** ৮
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিজ্ঞানেরআকস্মিকআবিষ্কার ৮
অমরনাথ রায়
জ্ঞানবিজ্ঞানের মজার খেলা ১০
সাধন দাসগুপ্ত ॥ **আলো আরও আলো** ১৫
সাধন দাসগুপ্ত ॥ **রোমাঞ্চকর রসায়ন** ১২
সাধন দাসগুপ্ত ॥ **ভাষা গণিত** ২০
সিদ্ধার্থ ঘোষ
অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ১৫
স্যাম লয়েড ও লুইস ক্যারোলের ধাঁধা ১০

কিশোর রচনাবলী

জগদীশচন্দ্র বসু ॥ কিশোর রচনা সমগ্র ২৫
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
কিশোর রচনা সমগ্র ৩০
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥
শার্লক হোমস্ কিশোর সমগ্র ২৫
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ রোমাঞ্চকর ২৫
মেঘনাদ সাহা ॥ কিশোর রচনা সঙ্কলন ১২

ভ্রমণ ও অভিযান

সুনির্মল বসু ॥ রোমাঞ্চের দেশে ৬
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
সুন্দরবনে সাত বৎসর ১০
ধীরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী ॥ দুরন্ত যাত্রী ৮
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ গঙ্গা যমুনা ৮
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥
আমাজনের অরণ্যে ৮
সুনির্মল রায় ॥ চাঁদের পাড়ি ৮
দেবব্রত চক্রবর্তী ॥ চক্রতীর্থের চমক ১০

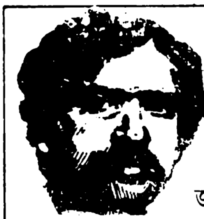

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর গল্প প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও চিঠিপত্রের মূল্যবান সঙ্কলন
জগদীশচন্দ্র বসু
কিশোর রচনা সমগ্র ২৫

কিশোর ক্লাসিক্‌স্

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ **তেপান্তর** ২০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **কিশোর অপু** ২৫
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্দীপন পাঠশালা ১০
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **ছোটদের কাজল** ১০
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদা বিচিত্রা** ২৫
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
টেনিদার অভিযান ২৫
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ **বাঙলার ডাকাত** ২৮
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অপুর ছেলেবেলা ১০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের অপরাজিত ১০

R/No 37390/81 KISHORE JNAN BIJNAN REGD NO WBEC 316 7TH YR VOL 9

ক্লাস অ্যানুয়ালে বেশী নম্বরের জন্য

তারকমোহন দাস ও সীমা সেন	লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	সায়েন্স ক্যুইজ
অলক চক্রবর্তী	ফিজিক্স ক্যুইজ
অরূপরতন ভট্টাচার্য	গণিত ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	নলেজ ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	কেমিস্ট্রী ক্যুইজ

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ । প্রতিটি ১০ টাকা

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত এবং ৮এ দীনবন্ধু লেন কলিকাতা ৬ নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও রঙিন পাতা মুদ্রণে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১২

দাম : 4·00 টাকা।